এপ্রিল ২০২১▪চৈত্র ১৪২৭-বৈশাখ ১৪২৮

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

মুজিবনগর সরকারের সুবর্ণ জয়ন্তী

নববর্ষ: বাঙালির প্রাণের উৎসব

ফিল্ম ইনস্টিটিউট স্থাপনে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ

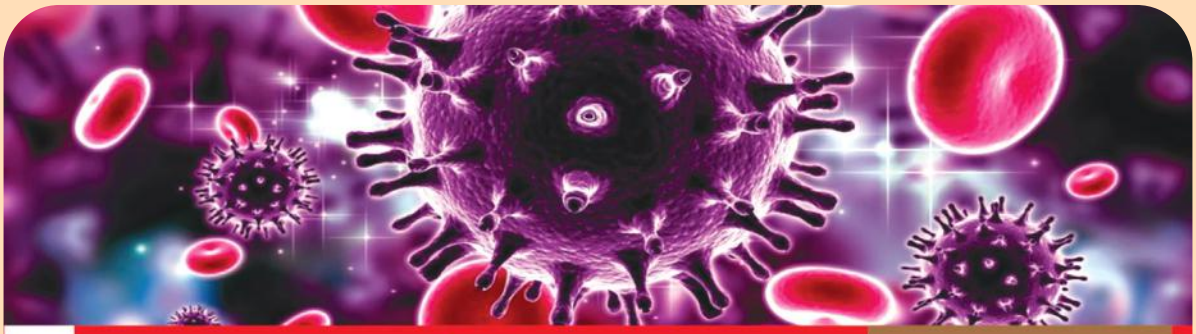

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

এপ্রিল ২০২১ ❑ চৈত্র ১৪২৭–বৈশাখ ১৪২৮

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ, মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোটো বোন শেখ রেহানাসহ অতিথিবর্গ ১৭ই মার্চ ২০২১ ঢাকায় জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনকালে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন– পিআইডি

সম্পাদকীয়

বাংলা নববর্ষ বাঙালির জাতীয় উৎসব; ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল বাঙালির প্রাণের উৎসব। বাঙালির সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাসে মিশে আছে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন। পুরনো জরাজীর্ণকে ঝেড়ে ফেলে বাঙালির জীবনে বৈশাখ আসে নতুন সম্ভাবনা, নতুন আশা নিয়ে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী মহামারি করোনার কারণে পহেলা বৈশাখ ১৪২৭ যেমন উদ্‌যাপিত হয়নি, তেমনি উদ্‌যাপিত হয়নি পহেলা বৈশাখ ১৪২৮। এ মুহূর্তে করোনা পরিস্থিতির অবনতির কারণে বাঙালি ঘরে বসেই সীমিত পরিসরে উদ্‌যাপন করেছে নববর্ষ। আমরা আশা করি, বিশ্ব করোনা মহামারি থেকে মুক্ত হবে। তাইতো নববর্ষ ১৪২৮ আমরা বরণ করে নিয়েছি নতুন প্রত্যাশায়। নববর্ষ ও বর্ষবরণ নিয়ে *সচিত্র বাংলাদেশ*-এ রয়েছে প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কবিতা।

১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর দিবস। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠনের পর ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় এ সরকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয় ১৭-২৬শে মার্চ ঢাকার জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে। এ নিয়ে রয়েছে প্রতিবেদন ও ফটোফিচার।

মুজিবনগর দিবস, বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস, বিশ্ব ধরিত্রী দিবস, বিশ্ব বই দিবস, জাতীয় চলচ্চিত্র দিবসকে উপলক্ষ করে এ সংখ্যায় রয়েছে প্রবন্ধ ও নিবন্ধ। এছাড়া গল্প, কবিতা ও অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক নিয়মিত প্রতিবেদন থাকছে এ সংখ্যায়।

আশা করি, *সচিত্র বাংলাদেশ* এপ্রিল ২০২১ সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
ডায়ানা ইসলাম সিমা

কপি রাইটার
মিতা খান

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

অলংকরণ : নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৯৭
e-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষান্মাষিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা
গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

সূচিপত্র

ভাষণ

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ ৪

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

বাঙালির অনির্বাণ বাতিঘর মুজিবনগর ৭
রফিকুর রশীদ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা ৯
ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ

বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ ১১
শামসুজ্জামান খান

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানমালার ছবি ১২-১৩

ফিল্ম ইনস্টিটিউট স্থাপনে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ ১৪
অনুপম হায়াৎ

রমজান ও রোজা ১৬
মুহাম্মদ ইসমাঈল

মুজিববর্ষে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর উপহার ১৮
আবু সালেহ মোহাম্মদ মুসা

বাংলা নববর্ষের পূর্বাপর ১৯
খান চমন-ই-এলাহি

করোনাকালে নববর্ষের প্রার্থনা ২১
শামসুজ্জামান শামস

বঙ্গবন্ধু ও ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ২৩
ইমরান পরশ

বৈশাখি মেলা অসাম্প্রদায়িকতার প্রেরণা ২৫
মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি ২৭
নূরজাহান বেগম

বঙ্গবন্ধুর হাতেই আজকের চলচ্চিত্রের গোড়াপত্তন ২৮
শিহাব শুভ

ধরিত্রী রক্ষায় প্রয়োজন সচেতনতা ২৯
শারমিন ইসলাম

অটিজম সমস্যা সমাধানে সরকারের কার্যক্রম ৩০
শিরিনা আক্তার

বই প্রজন্মান্তরের সেতুবন্ধ ৩১
শংকরী ঘোষ

গল্প

একটি মৃত সকাল ও বিদ্রোহী রহমাত খাঁ ৩২
শামস সাইদ

হাইলাইটস

কবিতাগুচ্ছ ৪০-৪৪

নাসির আহমেদ, কনক চৌধুরী, সিরাজউদ্দিন আহমেদ, নুরুল ইসলাম বাবুল, মিলন সব্যসাচী, দেবকী মল্লিক, আনসার আনন্দ, ছাদির হুসাইন ছাদি, আমিরুল হক, আপন চৌধুরী, মঈনুল হক চৌধুরী, মিজানুর রহমান মিথুন, শিরিন আক্তার, ফরিদ আহমেদ হৃদয়, প্রজীৎ ঘোষ, শহিদুল ইসলাম লিটন, ইমরুল ইউসুফ, ইজামুল হক, মো. রুস্তম আলী, আলী মামুদ, মোসলেম উদ্দীন

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৫
প্রধানমন্ত্রী ৪৬
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ৪৭
জাতীয় ঘটনা ৪৮
আন্তর্জাতিক ৪৯
উন্নয়ন ৫০
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫০
শিল্প-বাণিজ্য ৫১
শিক্ষা ৫১
বিনিয়োগ ৫২
নারী ৫২
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৩
কৃষি ৫৪
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৫
বিদ্যুৎ ৫৫
নিরাপদ সড়ক ৫৬
স্বাস্থ্যকথা ৫৬
কর্মসংস্থান ৫৭
যোগাযোগ ৫৮
ইতিহাস ও ঐতিহ্য ৫৯
চলচ্চিত্র ৫৯
সংস্কৃতি ৬০
মাদক প্রতিরোধ ৬০
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬১
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬১
প্রতিবন্ধী ৬২
ক্রীড়া ৬৩

শ্রদ্ধাঞ্জলি: ভাষাসৈনিক ইউসুফ কালু
চলে গেলেন না ফেরার দেশে ৬৪

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

করোনাভাইরাস মহামারিতে এসেছে নববর্ষ ১৪২৮। করোনা মহামারি থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়া হয় কোনো প্রকার আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই। দেশে একই দিনে শুরু হয়েছে পবিত্র মাহে রমজান। নববর্ষের প্রাক্কালে ১৩ই এপ্রিল ২০২১ জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীসহ সারা বিশ্বের বাঙালিদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এ সময় দেশবাসীকে তিনি করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ভাষণে তিনি দেশবাসীকে পবিত্র মাহে রমজানের মোবারকবাদ ও পহেলা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানান। প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি দেখুন, পৃষ্ঠা-৪

নববর্ষ: বাঙালির প্রাণের উৎসব

নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ আমাদের জাতীয় উৎসব। এই উৎসব বাঙালির জাতিসত্তার সঙ্গে যুক্ত বলেই ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের উৎসব হয়ে উঠেছে। পহেলা বৈশাখ বাঙালির প্রাণের আর মনের মিলন ঘটার উৎসব। শুভ দিনের বারতা নিয়ে আসে এই দিন। কিন্তু এবারের পহেলা বৈশাখেই করোনা মহামারি থেকে বাঁচার আকুতি নিয়ে এসেছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার আহ্বান। তাই ঘরে বসে অথবা অনলাইনে যে যার মতো উদ্‌যাপন করে পহেলা বৈশাখ। এ উৎসবে আমরা প্রত্যাশা করেছি মহামারিমুক্ত শুভ দিনের। নববর্ষ নিয়ে 'বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ', 'বাংলা নববর্ষের পূর্বাপর', 'করোনাকালে নববর্ষের প্রার্থনা' এবং 'বৈশাখি মেলা অসাম্প্রদায়িকতার প্রেরণা' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন যথাক্রমে, পৃষ্ঠা- ১১, ১৭, ১৯ ও ২৩

মুজিবনগর সরকারের সুবর্ণ জয়ন্তী

১৯৭০ সালে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ী দল আওয়ামী লীগ কিন্তু আওয়ামী লীগের সরকার গঠনে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী শুরু করে নানা ষড়যন্ত্র। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনী শুরু করে বর্বর গণহত্যা। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেপ্তারের পূর্বেই ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে ঘোষণা করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয় এবং ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে এ সরকার শপথ গ্রহণ করে। এ স্থানের নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় এ সরকারের অবদান অপরিসীম। দীর্ঘ ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত হয় বাংলাদেশের বিজয়। মুজিবনগর সরকারের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে 'বাঙালির অনির্বাণ বাতিঘর মুজিবনগর' ও 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন যথাক্রমে, পৃষ্ঠা- ৭ ও ৯

ফিল্ম ইনস্টিটিউট স্থাপনে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল প্রাদেশিক আইন পরিষদে বিল পাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেন 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' যা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (বিএফডিসি) নামে খ্যাত। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ফিল্ম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব ছিল। চলচ্চিত্রের গুরুত্ব অনুধাবন করে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২-১৯৭৫ সালে চলচ্চিত্র ইনস্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০১৩ সালে আইন পাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট। এ বিষয়ে দেখুন 'ফিল্ম ইনস্টিটিউট স্থাপনে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ' শীর্ষক নিবন্ধ, পৃষ্ঠা-১৪

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে মার্চ ২০২১ মহান স্বাধীনতা দিবস এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন– পিআইডি

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

[২৫শে মার্চ ২০২১]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী।

আসসালামু আলাইকুম।

২৬শে মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। এবার স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি হচ্ছে। আমরা উদ্‌যাপন করছি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। একইসঙ্গে উদ্‌যাপিত হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি– তিনি আমাদের এই সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের তৌফিক দান করেছেন।

এই শুভদিন উপলক্ষে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আমি দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে বসবাসকারী বাংলাদেশের সকল নাগরিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করছি সেইসব বন্ধুরাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিকে যাঁরা আমাদের চরম দুঃসময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের রাতে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী 'অপারেশন সার্চ লাইটের' নামে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাজারবাগ পুলিশলাইনস, পিলখানায় তৎকালীন ইপিআর হেডকোয়ার্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার ঘনবসতি এলাকাগুলোতে একযোগে হামলা চালায় পাকিস্তানি সামরিক জান্তা। হাজার হাজার মানুষকে গুলি করে হত্যা করে। আগুন ধরিয়ে দেয় অসংখ্য ঘরবাড়িতে। দেশের অন্যান্য শহরগুলোতে হাজার হাজার বাঙালিকে হত্যা করা হয়।

ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে পুলিশের এবং তৎকালীন ইপিআর-এর বীর বাঙালি সদস্যরা পালটা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় এবং পাড়া-মহল্লার অলি-গলিতে বেরিকেড তৈরি করে পাকিস্তানি সৈন্যদের চলাচলে বাধা দেয়। কিন্তু অত্যাধুনিক অস্ত্র, ট্যাংক আর অস্ত্রসজ্জিত যানবাহনের সামনে নিরস্ত্র প্রতিরোধ বেশি ক্ষণস্থায়ী হয় না। নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হামলা চালিয়ে নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে বন্দি হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সমগ্র জাতিকে নির্দেশ দেন প্রতিরোধ যুদ্ধের। মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার। তাঁর ঘোষণা তৎকালীন ইপিআর-এর ওয়ারলেসের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানি জান্তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করে।

এর আগে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় লাভের পর পাকিস্তানি শাসকেরা যখন ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে নিপীড়ন-নির্যাতনের আশ্রয় নেয়, তখনই অসহযোগ আন্দোলনের এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঘোষণা করেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা'।

বীর বাঙালি তাঁর নির্দেশে নয়-মাসের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে শত্রুমুক্ত করে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়।

আমি ২৫শে মার্চের সেই কালরাতের শহিদদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি। স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় চার নেতা, ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমার সালাম।

আমি গভীর বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকদের হাতে নির্মমভাবে নিহত আমার মা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিন ভাই মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা লে. শেখ জামাল ও দশ বছরের শেখ রাসেল, দুই ভ্রাতৃবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, চাচা শেখ আবু নাসেরসহ সেই রাতের সকল শহিদকে।

প্রিয় দেশবাসী,

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা ২৪ বছরের নিরন্তর রাজনৈতিক সংগ্রামের ফসল। আর এই সংগ্রামের শুরু থেকে শেষ

পর্যন্ত সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সৃষ্ট আন্দোলনে যে স্বাধিকারের বীজ বপন করেছিলেন, তাকেই সযত্নে লালন-পালন করে তিনি স্বাধীন মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পরিণত মহিরুহে রূপান্তরিত করেন। শেখ মুজিব থেকে পরিণত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়েই ১৯৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৮'র আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬'র ঐতিহাসিক ৬ দফা, ১৯৬৯'র গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০'র নির্বাচন এবং ১৯৭১'র রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা পাই স্বাধীনতা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নামের সেই মহাপুরুষের জন্ম হয়েছিল বলেই আজ আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক। তাঁর জন্ম হয়েছিল বলেই আজ আমরা নিজস্ব দেশ, ভাষা-সংস্কৃতি নিয়ে গর্ববোধ করি।

শেখ মুজিব একটি দেশ, একটি জাতি-রাষ্ট্রের স্রষ্টা। কাজেই তাঁর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী আমরা একযোগে উদ্‌যাপন করছি।

আমি বাংলাদেশের জনগণকে ধন্যবাদ জানাই এজন্য যে, জাতীয় জীবনের এই দুই গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক উদ্‌যাপনকালে স্বাধীনতাযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে তাঁরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসিয়েছেন।

সুধীবৃন্দ,

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শুধু একটি স্বাধীন-সার্বভৌম ভূখণ্ডেরই স্বপ্ন দেখেননি, তিনি স্বপ্ন দেখতেন এ জনপদের সাধারণ মানুষ, যারা শত শত বছর ধরে শোষণ-বঞ্চনা, নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, না খেয়ে না দেয়ে, রোগে-শোকে মারা গেছে, তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে। তাদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসার ব্যবস্থা করে উন্নত জীবন নিশ্চিত করতে।

আমাদের দুর্ভাগ্য মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় স্বাধীনতা বিরোধী কুচক্রী মহল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করে। তাঁকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে যেমন স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তেমনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়।

১৯৭২ সালে ২৮শে জুন সিলেটে এক সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন–'... প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী হবার জন্য আমি রাজনীতি করি নাই। আমি রাজনীতি করেছিলাম সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তির জন্য। এখন আমার রাজনীতির মুক্তি হয়েছে। আমার অর্থনীতির মুক্তি প্রয়োজন। এইটা না হলে স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে। যদি বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়, যদি বাংলার মানুষ সুখে বাস না করে, বাংলার মানুষ যদি অত্যাচার, অবিচারের হাত থেকে বাঁচতে না পারে তো এই স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শুধু স্বপ্ন দেখতেন না, কী করে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হয় তা তিনি জানতেন। স্বাধীনতার পর একেবারে শূন্য হাতে মাত্র সাড়ে তিন বছরে ধ্বংসপ্রাপ্ত রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, রেললাইন, পোর্ট সচল করে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করেন। ১২৬টি দেশের স্বীকৃতি ও ২৭টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ। বাংলাদেশকে তিনি স্বল্পোন্নত দেশের কাতারভুক্ত করেন।

১৯৭৫-পরবর্তী অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী অগণতান্ত্রিক শাসকেরা বাংলাদেশকে আদর্শচ্যুত করেছে।

দীর্ঘ একুশ বছর এদেশের মানুষকে ধোকা দিয়েছে। জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন করে তাদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে। বাংলাদেশকে ভিক্ষুকের দেশ হিসেবে বহির্বিশ্বে পরিচিত করেছে।

প্রিয় দেশবাসী,

স্বাধীনতার অর্ধশত বছর অতিক্রম করা জাতীয় জীবনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক। আমাদের জন্য এই সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব আরো বর্ণময় হয়েছে এজন্য যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে সরকার পরিচালনা শুরু করে। আজ বাংলাদেশ সম্পর্কে সকল নেতিবাচক এবং নিরাশাবাচক ভবিষ্যদ্বাণী অসার প্রমাণিত করে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে গর্বিত দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

এক দশক আগেও বাংলাদেশকে যেখানে দারিদ্র্য আর অনুন্নয়নের উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা হতো, আজ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞগণ সেই বাংলাদেশকেই দারিদ্র্যজয় এবং উন্নয়নের আদর্শ মডেল হিসেবে তুলে ধরছেন।

আমি ২০০৫-২০০৬ অর্থবছর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে কয়েকটি সূচকের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরছি।

২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার। বর্তমানে যা ২০৬৪ ডলার হয়েছে। ঐ সময়ে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪১.৫ শতাংশ। বর্তমানে দারিদ্র্যের হার কমে দাঁড়িয়েছে ২০.৫ শতাংশ। জিডিপি'র আকার ৪ লাখ ৮২ হাজার ৩৩৭ কোটি থেকে ২৮ লাখ কোটি টাকা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল মাত্র ০.৭৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ এক বিলিয়ন ডলারের কম– যা বর্তমানে ৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে।

২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে বাজেটের আকার ছিল ৬১ হাজার কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবছরের আমাদের বাজেটের আকার ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা। মানুষের গড় আয়ু ২০০৫-২০০৬ বছরের

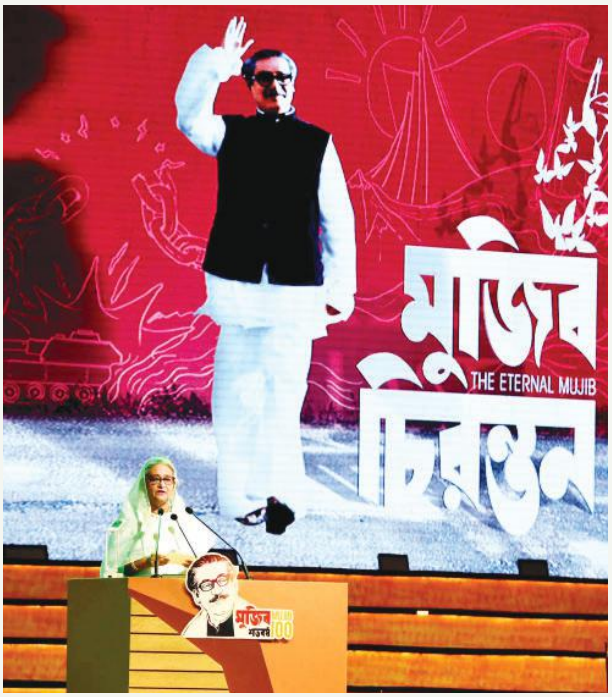

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই মার্চ ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন– পিআইডি

৫৯ বছর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০২০ সালে দাঁড়িয়েছে ৭২.৬ বছর। শিশুমৃত্যু হার কমে প্রতি হাজারে ৮৪ থেকে ২৮ এবং মাতৃমৃত্যু হার প্রতি লাখে ৩৭০ থেকে ১৬৫ জনে দাঁড়িয়েছে।

ঐ সময় সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ ছিল ৩৭৩ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে বরাদ্দ ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি। দানাদার শস্যের উৎপাদন ২০০৫-২০০৬ বছরের ১ কোটি ৮০ লাখ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৪ কোটি ৫৩ লাখ ৪৪ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ৪,৯০০ মেগাওয়াট থেকে ২৪ হাজার ৪২১ মেগাওয়াটে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী জনসংখ্যা ৪৭ থেকে ৯৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

আজকের এই অর্জন এ দেশের সাধারণ মানুষের। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক-পেশাজীবী, আমাদের প্রবাসী ভাইবোনেরা, এ দেশের উদ্যোক্তাগণ– তাদের শ্রম, মেধা এবং উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে দারিদ্র্য নিরাময়ের অসম্ভব কাজকে সম্ভব করে তুলেছেন। আমার সরকার শুধু নীতি সহায়তা দিয়ে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেছে। আপনারা প্রমাণ করেছেন, বাংলাদেশের মানুষ অনুকূল পরিবেশ পেলে যে-কোনো অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে।

আমাদের বিগত ১২ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আর্থসামাজিক সূচকে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। গত মাসে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে। গড় আয়ু, লিঙ্গ সমতা, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, নারী শিক্ষা, নারীর রাজনৈতিক অধিকার, নারী ও শিশুমৃত্যু হার, স্যানিটেশন, খাদ্য প্রাপ্যতা ইত্যাদি নানা সূচকে বাংলাদেশ শুধু তার প্রতিবেশী দেশগুলোর চেয়ে এগিয়ে যায়নি, অনেক ক্ষেত্রে অনেক উন্নত দেশকেও ছাড়িয়ে গেছে।

আজকের এই উত্তরণের পথ মোটেই মসৃণ ছিল না। দেশের ভেতরে-বাইরে স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে নানা অপতৎপরতা চালিয়েছে। সে প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত আছে। কাজেই আমাদের সকলকে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দেশবিরোধী সকল অপতৎপরতা রুখে দাঁড়াতে হবে। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা। প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে ছাত্রছাত্রী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছেড়ে, শ্রমিক কারখানা ছেড়ে, কৃষক লাঙল ফেলে, কামার, কুমার, জেলে তাদের কাজ ফেলে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সশস্ত্র বাহিনী এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে প্রতিরোধ সংগ্রামে শামিল হয়েছিলেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

একবার ভাবুন, আমরা আজ যে স্বাধীন দেশের মাটিতে আজ মুক্ত নিশ্বাস ফেলছি তা অর্জনে কত শত তরুণ অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন? কত মা তাদের সন্তান হারিয়েছেন, কত বাবা তাদের পুত্র হারিয়েছেন, কত ভাইবোন তাদের ভাই হারিয়েছেন, কত স্ত্রী তাদের স্বামী হারিয়েছেন, সন্তানেরা বাবা হারিয়েছেন? কত শত মুক্তিযোদ্ধা পঙ্গু হয়ে দুঃসহ জীবনযাপন করছেন?

তাদের একটাই প্রত্যাশা ছিল এদেশ স্বাধীন হবে। এদেশের মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। সকলে মৌলিক অধিকার ভোগ করবে। আজকে আমরা তাদের সেই প্রত্যাশা কিছুটা হলেও পূরণ করতে পেরেছি।

সুবর্ণ জয়ন্তীর এই শুভক্ষণে আমাদের শপথ নিতে হবে কেউ যেন বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে। দেশের গণতান্ত্রিক এবং উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে না পারে। আসুন, সকল ভেদাভেদ ভুলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত-সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলি।

প্রিয় দেশবাসী,

আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করছি। তবে এই উদ্‌যাপন যেন শুধু আনুষ্ঠানিকতা-সর্বস্ব না হয়। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে আমাদের দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার নতুন করে শপথ নিতে হবে।

এবারের স্বাধীনতা দিবস অন্যান্য বছরের স্বাধীনতা দিবসের মতো নয়। এবার স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি হলো। এই দিন আনন্দে অবগাহনের দিন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় তাই আহ্বান জানাই–

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।
কে আছ জাগিয়া পুরবে চাহিয়া,
বলো 'উঠ উঠ' সঘনে গভীরনিদ্রামগনে।
হেরো তিমিররজনী যায় ঐ, হাসে ঊষা নব জোতির্ময়ী–
নব আনন্দে, নব জীবনে,
ফুল্ল কুসুমে, মধুর পবনে, বিহগকলকূজনে।

সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স

বাঙালির অনির্বাণ বাতিঘর মুজিবনগর

রফিকুর রশীদ

বাঙালির ইতিহাসের বাতিঘর মুজিবনগর। মুজিবনগর ছোট্ট একটি স্থানের নাম। আজকের মুজিবনগর, ১৯৭১ সালে নাম ছিল তার বৈদ্যনাথতলা। যথার্থই ছায়াঢাকা পাখিডাকা শান্ত এক গ্রাম। কারো কারো মতে ভবেরপাড়া গ্রামেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ ঐ বৈদ্যনাথতলার বিশাল আমবাগান। বলা হয় ঐতিহাসিক আম্রকানন। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল এই আম্রকাননে উদিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্য। রৌদ্রকরোজ্জ্বল এই দিনে মেহেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী সবুজ শ্যামল নিস্তরঙ্গ গ্রাম বৈদ্যনাথ তলার কপালে নতুন নামের রাজমুকুট পরিয়ে দেয় ইতিহাস, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পবিত্র নামের সঙ্গে মিলিয়ে নতুন নামকরণ হয় মুজিবনগর। এখন সেই মুজিবনগর হয়েছে বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন ছোট্ট এক উপজেলা। এখানে আছে স্মৃতিসৌধ, মুক্তিযুদ্ধের অবিস্মরণীয় ম্যুরাল, মানচিত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিচয় এবং সব মিলিয়ে গড়ে উঠেছে মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স; বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র।

সেদিন কী ঘটেছিল মুজিবনগরে

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির সমন্বয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল, ভারতের আগরতলায়। কেউ বলে অস্থায়ী সরকার, কেউ বলে প্রবাসী সরকার। এ সরকারের প্রধান বা রাষ্ট্রপতি বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তখন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখলে সারা বাংলাদেশ। তাদের নির্মম অত্যাচারে প্রায় এক কোটি বাঙালি দেশ ছেড়ে আশ্রয় নেয় ভারতে। দেশত্যাগী বাঙালি নেতারা ভারতে বসে সরকার গঠন করলেও আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চান স্বদেশের মাটিতেই। সেই উদ্দেশে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল তাঁরা এসে সমবেত হন বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলের সীমান্তবর্তী গ্রাম বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে। সঙ্গে আসেন শ' খানেক দেশি-বিদেশি সাংবাদিক। সামনে উপস্থিত হন হাজার হাজার স্থানীয় জনতা। অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি হয়েছিল একটি ছোট্ট মঞ্চ। অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য মঞ্চে আসেন টাঙ্গাইল থেকে নির্বাচিত এমএনএ আব্দুল মান্নান। তিনি বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন সৈয়দ নজরুল ইসলামকে। স্পিকার অধ্যাপক ইউসুফ আলী সরকারপ্রধানকে শপথবাক্য পাঠ করালে তিনি তাঁর মন্ত্রিপরিষদের নাম ঘোষণা করেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদসহ অন্য তিনজন মন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমেদ, এ এইচ এম কামারুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলীও শপথগ্রহণ করেন। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ও নির্বাচিত এমএনএ কর্নেল এমএজি ওসমানী। ঐতিহাসিক এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই ঘোষণাপত্রের মূল্য অপরিসীম। নব গঠিত সরকারের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ও শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন, গার্ড পরিদর্শন করেন এবং গার্ড অব অনারের সালাম গ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের মাধ্যমে সারা বিশ্বের সহযোগিতা ও স্বীকৃতির দাবি জানান। সব শেষে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বাঙালির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে বৈদ্যনাথতলার নামকরণ করেন 'মুজিবনগর' এবং এই মুজিবনগরকে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী বলেও ঘোষণা করেন। এদিন থেকে বাংলাদেশের প্রথম সরকারেরও নাম হয়ে যায় 'মুজিবনগর সরকার'। সত্যিকারের কথায় এই মুজিবনগর সরকারের বিচক্ষণ এবং দূরদর্শী নেতৃত্বেই সুষ্ঠুভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার মাধ্যমে বাঙালির বিজয় অর্জিত হয় এবং আন্তর্জাতিক মহলের সাহায্য, সমর্থন ও স্বীকৃতি আদায় সম্ভব হয়। এসব কারণে ১৭ই এপ্রিল হয়ে ওঠে 'মুজিবনগর দিবস'।

মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের ম্যুরাল

কেন মুজিবনগরে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান

বাংলাদেশের নবগঠিত সরকারের নেতৃবৃন্দের উপর যে-কোনো মুহূর্তে আক্রমণ চালিয়ে বর্বর পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম স্তব্ধ করে দিতে পারে–এমন আশঙ্কার কারণে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চলে নিরাপদ স্থান খোঁজা হয়। সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় ভারতের সঙ্গে সহজ যোগাযোগ ও নিরাপত্তার উপরে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক তাজউদ্দীন আহমদ এবং ব্যারিস্টার আমীর উল ইসলাম ২৯শে মার্চ (১৯৭১) বহু পথ ঘুরে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় চুয়াডাঙ্গা সীমান্ত দিয়ে ভারত গমনের সময় এতদঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, জনগণের বৈপ্লবিক মনোভাব এবং কলকাতার দূরত্ব সম্পর্কে অবহিত হন। তাই মেহেরপুরের সীমান্তগ্রাম বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। ভারত থেকে এখানে প্রবেশ একেবারেই সহজ, কলকাতার দূরত্বও বেশি নয়। অন্যদিকে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে স্থলপথে এখানে পৌঁছানো অনেক কঠিন ছিল দুর্গম রাস্তাঘাটের কারণে। আর আকাশপথে আসতে হলে ভারতীয় আকাশসীমার মধ্য দিয়েই আসতে হবে। পাকিস্তান নিশ্চয়ই সে ঝুঁকি নেবে না। তাছাড়া আমবাগানের ঘন পাতার আড়ালের অনুষ্ঠান আকাশ থেকেও সহজে দেখা সম্ভব নয়। এসব দিক বিবেচনায় আরো অনেক মুক্ত অঞ্চল থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের প্রথম সরকারের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ও শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের জন্য মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলাকেই নির্বাচন করা হয় এবং সেদিন থেকে নতুন নামকরণ করা হয় মুজিবনগর।

কেন সরকার গঠন, কেন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান

সার্বভৌম দেশ থাকলে দেশ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় একটি বৈধ, নিয়মতান্ত্রিক এবং জনসমর্থিত সরকার। বাংলাদেশেরই বা সেটা থাকবে না কেন? ১৯৭০ সালে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন এদেশে হয়েছে। সে নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ী দল আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে দেয়নি পাকিস্তানের সামরিক জান্তা। বরং তারা ২৫শে মার্চ (১৯৭১) রাতের অন্ধকারে গণহত্যা চালিয়েছে এদেশে, আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছে নিরীহ জনগণের ঘরবাড়ি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস, প্রেসক্লাবে এবং সর্বোপরি বিজয়ী দলের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে করেছে গ্রেপ্তার। গ্রেপ্তারের পূর্বেই বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে ঘোষণা করেন আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। শুধু স্বাধীনতার ঘোষণাই নয়, স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে যান বাংলার মাটি থেকে দখলদার পাকিস্তান বাহিনীর শেষ সৈনিককে না হঠানো পর্যন্ত যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।

বাংলাদেশের জনগণের অন্তরে মুকুলিত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে এই ঘোষণায়। আর এ ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য প্রবাসে বসেই বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও ভূমিকা পালন করেন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য সহযোদ্ধা তাজউদ্দীন আহমদ। সরকার গঠনের ফলে সারা দেশের বিচ্ছিন্ন এবং স্বতঃস্ফূর্ত যুদ্ধ তৎপরতাকে একক নিয়ন্ত্রণে আনা এবং বাঙালির ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন ও সহযোগিতার আহ্বান জানানো সম্ভব হয়। বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল মুজিবনগরে সেই সরকারের আত্মপ্রকাশ, শপথগ্রহণ ও স্বাধীনতার সনদ ঘোষণা করা না হলে বাঙালির এতদিনের আন্দোলন-সংগ্রামও বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা বলে অপপ্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হতো। মনে রাখা জরুরি, নবগঠিত এ সরকারের তৎপরতার কারণেই দুনিয়ার মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় যে বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উদ্দেশে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ আইনানুগ পদ্ধতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার গঠন করেছে। প্রকৃতপক্ষে এখান থেকেই শুরু হয় বাঙালির ঘুরে দাঁড়াবার পালা, বিজয়ের লক্ষ্যে সর্বাত্মকভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আয়োজন।

দেশে-দেশে প্রবাসী সরকার ও মুজিবনগর সরকার

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে প্রবাসী সরকার গঠিত হয়েছে, বাংলাদেশেরও প্রথম সরকার গঠিত হয়েছে প্রবাসেই। তবু অন্যান্য প্রবাসী সরকারের সঙ্গে আমাদের সরকারের মৌলিক পার্থক্য রচনা করেছে মুজিবনগর অধ্যায়। প্রথম পার্থক্য হচ্ছে আমাদের সরকার জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত এবং কর্তৃত্বপ্রাপ্ত, অনেক প্রবাসী সরকারের তা থাকে না। পরের পার্থক্য রচিত হয় মুজিবনগরে এসে। আমাদের সরকার শত্রুকবলিত বাংলাদেশের মুক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে (মুজিবনগরে) স্বাধীনতার দলিল বা ঘোষণাপত্র প্রচারের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরে এবং সেই ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য সরকার দৃঢ় প্রত্যয়ে শপথ গ্রহণ করে। প্রবাসী সরকার নয়, বস্তুতপক্ষে এ সরকার 'মুজিবনগর সরকার' নামেই অধিক পরিচিতি লাভ করে এবং প্রবাস নয়, মুজিবনগরকেই বাংলাদেশের রাজধানী বলে ঘোষণা দেয়। পৃথিবীর অন্যান্য প্রবাসী সরকারের সঙ্গে মুজিবনগর সরকারের মৌলিক পার্থক্য এখানেই, এই মুজিবনগরে।

মুজিবনগর দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তী

এ বছর বাংলাদেশে উদ্‌যাপিত হচ্ছে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। এরই মাঝে ৫০ বছরে পা দিয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় ২৬শে মার্চ উজ্জ্বলতম ডেটলাইন এতে কোনো সন্দেহ নেই। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী লড়াই শেষে আসে বিজয়ের দিন ১৬ই ডিসেম্বর। ইতিহাসের আলোকপ্রভায় সমুজ্জ্বল এই দিনটিও বাংলাদেশ পালন করে স্বজন হারানোর বেদনা প্রাণের গভীরে লুকিয়ে রেখে আনন্দ ও গৌরবের সঙ্গে। মুজিবনগরই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সিংহদুয়ার। এ বছর সেই মুজিবনগর দিবসেরও সুবর্ণ জয়ন্তীর বছর।

লেখক : সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ, গাংনী, মেহেরপুর

১৭ই এপ্রিল ১৯৭১, মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম গার্ড অব অনার গ্রহণ করছেন। ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা

ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর ১০ই এপ্রিল সরকার গঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে এ সরকার শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে বৈদ্যনাথতলা গ্রামের নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল থেকে ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি পর্যন্ত ছিল মুজিবনগর সরকারের কার্যকাল। মুজিবনগর সরকার গঠিত না হলে আমরা আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী অথবা বিদ্রোহী হয়ে পড়তাম। স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার মাত্র ১৫ দিনের মাথায় সরকার গঠন হবে তা অকল্পনীয় ছিল পাকিস্তানিদের কাছে। কিন্তু দোর্দণ্ড প্রতাপে ঘুরে দাঁড়ায় স্বাধীন বাংলাদেশ। গঠন করা হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকার বা মুজিবনগর সরকার। এই অস্থায়ী সরকার গঠনের মধ্য দিয়েই পরিকল্পিত কায়দায় মুক্তিবাহিনীকে সংগঠিত ও সমন্বয়সাধন করে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনা ও স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায় করেছিল মুজিবনগর সরকার। ১০ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপ্রধান ও সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক করে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করা হয়। এই সরকার সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপ্রধান এবং বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান ও সশস্ত্রবাহিনীর অস্থায়ী সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত করে। তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলীকে অর্থমন্ত্রী, খোন্দকার মোশতাক আহমেদকে পররাষ্ট্র, আইন এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী, এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে স্বরাষ্ট্র, কৃষি, ত্রাণ এবং পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হয়। চারজন মন্ত্রীকে ১২টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। মুজিবনগর সরকার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন আদায়, শরণার্থী ব্যবস্থাপনা, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশবাসীর পাশে দাঁড়ানো ও তাঁদের মনে আশা সঞ্চারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধকে সুচারুভাবে পরিচালিত করে সফল পরিসমাপ্তির দিকে ধাবিত করে। মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের অবদান অপরিসীম।

সীমিত সামর্থ্যের মাঝে মুজিবনগর সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ ও প্রশাসন পরিচালনা করেছে। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এবং স্বাধীনতার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি অর্জনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই সরকার এক কোটির বেশি শরণার্থীর জন্য ত্রাণ, দেশের অভ্যন্তর থেকে লাখ লাখ মুক্তিপাগল ছাত্র-জনতা-যুবককে প্রশিক্ষণ দিয়ে গেরিলা বাহিনী গঠন করে; যা পাকিস্তানিদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করেছিল। একইসঙ্গে স্বাধীন বাংলা বেতারের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ রাখা, বিশ্ব জনমত গঠনসহ বহুমুখী চ্যালেঞ্জের কাজ সম্পূর্ণ করেন এ সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যরা; যা সমকালীন পরিস্থিতির বিচারে অতুলনীয় ও অবিস্মরণীয়।

এই সরকার ছিল সম্পূর্ণ সাংবিধানিক, প্রতিনিধিত্বশীল ও বৈধ। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল এ সরকার গঠিত হয় এবং ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে। উক্ত অনুষ্ঠানে শপথ বাক্য এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী এবং শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আব্দুল মান্নান। মুজিবনগর সরকারের অন্যতম সফলতা হলো– বাংলার শোষিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত জনতার মুক্তির বাসনাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমর্থন লাভ এবং মাত্র ৯ মাসে স্বাধীনতা অর্জন। মুজিবনগর সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করে এবং বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে বিশ্বজনমতকে বাংলাদেশের পক্ষে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছিল। সামরিক বিজয়ের আগেই কূটনৈতিক সাফল্যের সূচক হিসেবে ভুটান ও ভারতের স্বীকৃতি অর্জন করা। মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় সাধন, মুক্তিযোদ্ধা এবং সাধারণ জনগণের মনোবল ঠিক রেখে সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে স্বাধীনতাযুদ্ধ পরিচালনা করার কৃতিত্ব এ সরকারের।

দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে বৈদ্যনাথতলা গ্রামের নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। প্রবাসী, বিপ্লবী, অস্থায়ী বা মুজিবনগর সরকার যে নামেই ডাকা হোক না কেন; মুক্তিযুদ্ধের সময়ে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার মুজিবনগর সরকার নামে সমধিক পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুজিবনগর সরকার যেমন সশস্ত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী সংগঠিত করেছিল, একইভাবে সরকার পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় ও বিভিন্ন বিভাগ গঠন করে বেসামরিক প্রশাসনকে সংগঠিত করে দেশের নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, নিজস্ব আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা, স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা, প্রায় এক কোটির মতো শরণার্থীর জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সর্বোপরি স্বাধীনতা অর্জন, এসব দিক বিবেচনায় মুজিবনগর সরকার ছিল সত্যিই অতুলনীয় ও অবিস্মরণীয়।

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল বেলা ১১টায় কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার মুক্তাঞ্চল ভবের পাড়ার বৈদ্যনাথতলায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে। অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কর্নেল ওসমানী ও অন্যদের নিয়ে বৈদ্যনাথ তলায় মঞ্চে এলেন। আশপাশের গ্রাম থেকে চেয়ার আনা হয়েছে। ক্যাপ্টেন মাহবুব আর তওফিক এলাহী চৌধুরী তখন অনুষ্ঠান সূচি প্রণয়নে ব্যস্ত। গার্ড অব অনার দেওয়ার জন্য আনসার বাহিনী প্রস্তুত। ক্যাপ্টেন মাহবুব তাদের নিয়ে গার্ড অব অনার দিলেন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে। প্রায় হাজার দুই লোক এসেছিল অনুষ্ঠানে দর্শক হিসেবে। শতাধিক বিদেশি সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার ও টিভি ক্যামেরাম্যান এসেছেন। গার্ড অব অনার ও জাতীয় সংগীতের পর নেতারা মঞ্চে বসলেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ স্বাধীনতা সনদের পক্ষে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপস্থিত জনতা ও সাংবাদিকদের সঙ্গে তার মন্ত্রিসভা-সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তার ভাষণে বলেন, 'পৃথিবীর মানচিত্রে আজ যে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হলো তা চিরদিন থাকবে। পৃথিবীর কোনো শক্তি তা মুছে দিতে পারবে না। পাকিস্তান আজ মৃত, স্বাধীন বাংলাদেশ আজ একটা বাস্তব সত্য। শত-সহস্র মানুষের মৃত্যু বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর হয়ে থাকবে।

নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিনিধিদের ইচ্ছার শতভাগ প্রতিফলন ঘটিয়ে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখে, রাজনৈতিক বৈধতা অর্জন করে সেদিন রাষ্ট্র ও সরকার গঠিত হয়েছিল। আর এসব কিছুর বৈধ ভিত্তি ছিল বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত 'স্বাধীনতার ঘোষণা'। মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে তথা ১৯৭১-এর এপ্রিলের ১০ই ও ১৭ই তারিখে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সরকারের প্রধানতম লক্ষ্য ছিল সাংবিধানিকভাবে রাজনৈতিক বৈধতা নিশ্চিত করে সমগ্র বিশ্বের সমর্থন নিয়ে জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করে বিজয় ছিনিয়ে আনা। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে জাতীয় নেতৃবৃন্দের বীরত্বপূর্ণ অবদান চিরস্মরণীয়। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানমালায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানগণ এসে গিয়েছেন, তাতে দেশের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় ইতিহাসের গৌরবময় দিনগুলো স্মরণ করে জাতীয় মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধিই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশির আম্রকাননে বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ে বাংলার যে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল তার ঠিক ২১৪ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল বৈদ্যনাথতলা গ্রামের আরেক আম্রকাননে যেন বাংলার সেই অস্তমিত সূর্য আবারও উদিত হয়। যা বাংলার নির্যাতিত মানুষের মনে আশা জাগিয়েছিল। পথ দেখিয়েছিল নতুন দিনের, নতুন সূর্যের। বাংলাদেশের যে সরকার গঠন করা হয় তা ছিল জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়েই গঠিত। ফলে এটি ছিল সম্পূর্ণ বৈধ ও সাংবিধানিক সরকার। যুদ্ধে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এই সরকারের শপথ শুধু একটি সরকার গঠনের শপথ ছিল না। এই শপথ ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং অবিচারের বিরুদ্ধে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করারও শপথ। সর্বোপরি মুজিবনগর সরকার ছিল নেতৃত্ব, প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক দিক থেকে এক অনন্য ও অসাধারণ।

লেখক: কলামিস্ট ও গবেষক এবং সাবেক উপ-মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ

শামসুজ্জামান খান

বাংলা নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ আমাদের জাতীয় উৎসব। আমাদের আরো উৎসব আছে, কিছু ধর্মীয় উৎসব আর কতক ঋতু উৎসব।

আজ আমরা আমাদের সব উৎসবের কথা বলব না শুধু নববর্ষ উৎসবের কথা বলব। বাংলা নববর্ষ উৎসব কখন, কীভাবে শুরু হয়েছে তা ঠিক ঠিক বলা কঠিন। ইতিহাসেও তেমনভাবে কিছু নেই। তবে প্রাচীনকাল থেকেই গ্রামীণ বাংলাদেশে 'আমানি' নামে একটি পারিবারিক উৎসব চালু ছিল। প্রতিবছর চৈত্রসংক্রান্তির দিনগত রাতে অর্থাৎ পহেলা বৈশাখের আগের রাতে বাড়ির গৃহিণী একটি ঘটে পানি ঢেলে তাতে কচি একটি আমপাতার ডাল রেখে দিতেন। আর ঘটে কিছু আতপ চাল ছেড়ে দেওয়া হতো। পহেলা বৈশাখের সকালে সেই আমপাতার ডালটি ঘটের পানিতে ডুবিয়ে সেই পানি বাড়ির সকলের শরীরে ছিটিয়ে দেওয়া হতো। আর ঘটে ভেজানো চাল বাড়ির সবাইকে খেতে দেওয়া হতো।

লোকবিশ্বাস ছিল–এতে সারা বছর সকলের মঙ্গল হবে। গৃহকর্তা এই ভেজা চাল খেয়ে ক্ষেতে হালচাষ করতে যেতেন। মনে করা হতো, এতে ফসলের কোনো অমঙ্গল হবে না। এই বিষয়টি পরবর্তীকালে বাংলা নববর্ষের উৎসবের একটি অংশ হয়ে যায়।

আরেকটি বড়ো ব্যাপার ছিল মেলা। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় চৈত্রসংক্রান্তির দিনে এবং পহেলা বৈশাখ সকালে মেলা বসত। এই মেলার খুব প্রয়োজন ছিল। কারণ কৃষিভিত্তিক বাংলায় মানুষের হাতে কাঁচা পয়সা ছিল না। আর কাছেপিঠে এখনকার মতো এত দোকানপাটও ছিল না। তাই চটজলদি প্রয়োজনের জিনিসটি কিনে এনে ব্যবহার করাও ছিল কঠিন। তাই প্রতিবছরের এই মেলা থেকেই গ্রামের মানুষ হাঁড়িকুড়ি, দা-কাঁচি থেকে শুরু করে সংসারের সারা বছরের যাবতীয় দ্রব্য বা তৈজসপত্র কিনে রাখত।

এই ছিল গ্রামীণ মেলার আদি উপায়-উপকরণ। আরো পরে ইংরেজ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে জমিদারি প্রথা চালু করা হয়। জমিদাররা খাজনা আদায়ের জন্য বছরের প্রথম দিনে তাদের বাড়িতে 'পুণ্যাহ' উৎসব করতেন। সেই উৎসবে চাষি-প্রজারা জমিদারির খাজনা পরিশোধ করত এবং মিষ্টিমুখে আপ্যায়িত হতো। তখন কিছু কিছু ব্যাবসাবাণিজ্য গড়ে উঠেছে। অতএব দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিস দোকানিরা বেচা-বিক্রিও করতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের হাতে তো নগদ পয়সা ছিল না। তাই তারা বাকিতে দোকান থেকে জিনিস কিনত। কিন্তু এই যে ধারে কেনা জিনিস, এই ধার তো শোধ করতে হবে। ব্যবসায়ীরা তাই বছরের প্রথম দিনে হালখাতা করতেন। সেই হালখাতার দিনে ক্রেতারা দোকানির দেনা পরিশোধ করে মিষ্টিমুখ করে যেতেন। দোকানিরা তাদের দোকান সাজাতেন নানান রঙিন কাগজের ঝালর বানিয়ে আর আগরবাতি-ধূপধুনো জ্বালিয়ে। একটা ছিমছাম, ছাপছুতরো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে ক্রেতা-বিক্রেতার এই সম্মেলন বেশ আনন্দপূর্ণই হতো।

এই চারটি উপাদান ছিল প্রাচীন বাঙালির পহেলা বৈশাখের মূল অঙ্গ। পরে ইতিহাস এগিয়েছে। মোগল বাদশাহরা দিল্লিতে চালু করলেন ইরানের নববর্ষ উৎসব 'নওরোজ'-এর অনুকরণে উৎসব ও মীনা বাজার। সেও ছিল রাজরাজরা, অভিজাত ধনী বণিকদের নববর্ষের উৎসব। বাংলা নববর্ষ সেখান থেকেও পেয়েছে। এরও পরে ইংরেজ আমলে এসে কলকাতায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারে ইংরেজদের নববর্ষ উদ্‌যাপনের আদলে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের রীতি চালু হয়। ১৮৯৪ সালে বেশ ঘটা করেই ঠাকুর পরিবারে নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। সেই থেকে নগরবাসীর শিক্ষিত পরিবারে কলকাতা শহর এবং শান্তিনিকেতনসহ পশ্চিম বাংলার নানা শহরে নববর্ষ উদ্‌যাপনের রীতি চালু হয়।

বাংলাদেশে এই আধুনিক ধারার নববর্ষ চালু হয়েছে ষাটের দশকের প্রথম দিকে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আমলে পূর্ব বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক বাংলা নববর্ষে ছুটি ঘোষণা করেন। সেই সময় থেকে ঢাকাসহ পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শহরে নববর্ষ উৎসব চালু হয়। ঢাকার মাহবুব আলী ইনস্টিটিউট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকের উদ্যোগে কার্জন হলে নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। তখন ঐকতানসহ কয়েকটি সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এবং ওয়ারীর র‍্যাংকিন স্ট্রিটেও এই উৎসবের সূচনা করে। তবে বর্তমানে ঢাকা শহরে নববর্ষের উৎসব যে বর্ণাঢ্য অবয়ব, নব আঙ্গিক ও বিপুল আয়তনে প্রচলিত হয়েছে, তার ইতিহাস রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের এই জাতীয় উৎসবটি পাকিস্তান সরকার করতে দিতে চাইত না। এই বাধার মুখেই বাঙালি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

পূর্ব বাংলার বাঙালি তার শিকড় অনুসন্ধান করে নতুনভাবে সাজায় বাংলা নববর্ষের উৎসবকে। এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা 'ছায়ানট' (১৯৬১)-এর। ছায়ানট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি রমনার বটমূলে ১৯৬৭ সাল থেকে চালু করে নববর্ষের এই উৎসব। এই উৎসব বাঙালির জাতিসত্তার সঙ্গে যুক্ত বলেই অতি দ্রুত তা জনপ্রিয় হয় এবং প্রতিবছরই বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের উৎসব হয়ে ওঠে। নানা ডিজাইনের রং-বেরঙের পাঞ্জাবি-পায়জামা-শাড়িতে সজ্জিত বাঙালি পুরুষ-নারীর বিপুল সমাগমে এই উৎসব এখন বাঙালির সর্ববৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠানে রূপ লাভ করেছে। এই উৎসব একসময় গ্রাম থেকে গ্রামে শুরু হয়েছিল কিন্তু পরে আর খুব বড়ো আকার গ্রহণ করেনি। এখন এই উৎসব গ্রাম থেকে বর্ণাঢ্য সাজে সজ্জিত হয়ে রাজধানী ছাড়িয়ে বিভাগ, বিভাগ ছাড়িয়ে জেলা, জেলা ছাড়িয়ে উপজেলা এবং গ্রাম পর্যন্ত নব আঙ্গিকে এবং নব সাজে চালু হয়ে গেছে। এই উৎসব বাঙালি জীবনে যে আনন্দ বয়ে আনে, তার তুলনা বিরল।

[১৪ই এপ্রিল ২০২১ বিশিষ্ট ফোকলোরবিদ, বাংলা একাডেমির সভাপতি ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রফেসর শামসুজ্জামান খান পরলোক গমন করেন। তাঁর স্মরণে সচিত্র বাংলাদেশ পত্রিকার এপ্রিল ২০১৮ সংখ্যা থেকে লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হলো]

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানমালার ছবি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে ১৭ই মার্চ থেকে ২৬শে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার বিশেষ ছবি:

১. *রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৭ই মার্চ ২০২১ মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহকে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে স্বাগত জানান। এসময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন*

২. *নেপালের রাষ্ট্রপতি বিদ্যা দেবী ভান্ডারি এ অনুষ্ঠানমালার ষষ্ঠ দিন ২২শে মার্চ ২০২১ বক্তব্য রাখেন*

৩. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ডা. লোটে শেরিং এ অনুষ্ঠানমালার অষ্টম দিন ২৪শে মার্চ ২০২১ 'মুজিব শতবর্ষের কোমেমোরেটিভ স্ট্যাম্প' উপহার দেন

৪. এ অনুষ্ঠানমালার পঞ্চম দিন ২১শে মার্চ ২০২১ জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের আলোচনা পর্বে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ স্বাগত বক্তব্য প্রদান ও অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন

৫. *দশ দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানমালার সমাপনী দিন ২৬শে মার্চ ২০২১ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য রাখেন*

৬. *এ অনুষ্ঠানমালার পঞ্চম দিন ২১শে মার্চ ২০২১ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান*

৭. *ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে এ অনুষ্ঠানমালার সমাপনী দিন ২৬শে মার্চ ২০২১ 'মুজিব চিরন্তন' শ্রদ্ধা-স্মারক প্রদান করেন জাতির পিতার কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা*

৮. *এ অনুষ্ঠানমালার প্রথম দিন ১৭ই মার্চ ২০২১ মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহকে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী 'মুজিব চিরন্তন' সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন*

৯. *এ অনুষ্ঠানমালার তৃতীয় দিন ১৯শে মার্চ ২০২১ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য রাখেন*

১০. *শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও উপস্থিত অতিথিবর্গ এ অনুষ্ঠানমালার তৃতীয় দিন ১৯শে মার্চ ২০২১ আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনকালে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন*

[ছবি পিআইডি'র সৌজন্যে]

ফটোফিচার: সোমেন বিশ্বাস

নিবন্ধ

ফিল্ম ইনস্টিটিউট স্থাপনে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ

অনুপম হায়াৎ

জাতির পিতা মহান নেতা 'রাজনীতির কবি' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) ছিলেন অম্লান নক্ষত্র। তাঁর বিচ্ছুরিত আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে– মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব ও রাষ্ট্রপতিত্বকালে অঙ্কুরিত হয়েছে নতুন, চলমান ও ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের চলচ্চিত্র সংস্কৃতি কাঠামো। এরই অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর শাসনকালে চলচ্চিত্র শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক নানা উদ্যোগ বক্ষমান প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রী থাকার সময় ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল প্রাদেশিক আইন পরিষদে বিল পাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেন 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' (যা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা সংক্ষেপে বিএফডিসি নামে খ্যাত)। এর ফলে দেশে চলচ্চিত্র শিল্পের ভিত্তিভূমি স্থাপিত হয়। এগিয়ে চলে ঢাকাভিত্তিক চলচ্চিত্রের জগৎ। এর আগে পূর্ব বাংলার প্রেক্ষাগৃহগুলো ছিল বিদেশি তথা অস্থানীয় চলচ্চিত্রের বাজার।

এফডিসির সহায়তায় নির্মিত চলচ্চিত্র ১৯৫৯ সাল থেকে মুক্তি পেতে থাকে। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ও স্থাপত্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শত্রুমুক্ত পরিবেশে বিধ্বস্ত দেশে শুরু হয় নবনির্মাণের পালা, রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রে পুরোনো পাকিস্তানি নিয়ন্ত্রণ ও অতি বাণিজ্যলোভী মানসিকতার বদলে সৎ, জীবনঘনিষ্ঠ নির্মল চেতনার জন্ম হয়। চলচ্চিত্র তরঙ্গায়িত হয় নব-উদ্যম, নব-নির্মাণ, নব বিষয়, প্রকরণ ও প্রত্যাশায়। চলচ্চিত্রের পর্দায় মুক্তিযুদ্ধ যোগ করে নতুন মাত্রা। চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন, চলচ্চিত্র চর্চা, সৎ চলচ্চিত্রের পরিসর হয় বিস্তৃত। পাশাপাশি শিক্ষিত, সচেতন, চলচ্চিত্রপ্রেমীরা দাবি তোলে চলচ্চিত্র অধ্যয়ন-পঠন-পাঠনের জন্য ফিল্ম ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং চলচ্চিত্র সংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার জন্য। বঙ্গবন্ধুর সরকার (১৯৭২-১৯৭৫) এই উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেন বিভিন্ন উদ্যোগ। এসবের মধ্যে ছিল ফিল্ম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও বিদেশে চলচ্চিত্র শিক্ষার্থী প্রেরণ ও প্রয়োজনীয় বাজেট সংস্থান। অন্যদিকে বেসরকারি পর্যায়েও চলচ্চিত্র শিক্ষা ও অনুধাবনের জন্য প্রদর্শনী, প্রকাশনা, সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। চলচ্চিত্র সংসদ চলচ্চিত্র শিক্ষার জন্য ফিল্ম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার দাবি তোলে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়ও চলচ্চিত্র শিক্ষার প্রসঙ্গ প্রাধান্য পায়। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধু সপরিবার শহিদ হন। পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে চলচ্চিত্রের পর্দা থেকে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা মুছে ফেলা হয়। অতঃপর অনেক আন্দোলনের পর বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিষ্ঠা করেন 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট'। ২০১৪ সালে তিনি এই ইনস্টিটিউট ও শিক্ষা কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন। এর ফলে মহৎ পিতার মহান আদর্শের মশালের বিচ্ছুরিত আলোর মন্তাজ তাঁরই সুকন্যার হাত ধরে উদ্ভাসিত হয়েছে সংস্কৃতির নবতরঙ্গে।

চলচ্চিত্র শিক্ষার নানান উদ্যোগ (১৯৭২-১৯৭৫)

স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর বঙ্গবন্ধুর সরকার দেশের সর্বক্ষেত্রে উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য বিভিন্নমুখী পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ গঠন ও পুনর্গঠন করা হয়। এরই অংশ হিসেবে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় পুনর্গঠিত হয় এবং চলচ্চিত্র বিষয়টি এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। সরকার চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য এফডিসি, ডিএফপি, ফিল্ম সেন্সর বিধি ও বোর্ড, বিদেশে চলচ্চিত্র মেলা, উৎসব, প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ, রপ্তানি কার্যক্রম, বিদেশে চলচ্চিত্র শিক্ষার্থী প্রেরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। চলচ্চিত্রকে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর আওতায় একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউট স্থাপনেরও অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় চলচ্চিত্র উন্নয়ন: বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) চলচ্চিত্রের উন্নয়নের জন্য ৪ কোটি ১০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থ ফিল্ম স্টুডিওর সম্প্রসারণ, ঢাকা ও চট্টগ্রামে নতুন ফিল্ম স্টুডিও স্থাপন, সারা দেশে ১০০টি নতুন সিনেমা হল নির্মাণ এবং ফিল্ম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব ছিল।

ফিল্ম ইনস্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগঃ দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে দেশে একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউট স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। এই খাতে এক কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়। প্রস্তাবিত ফিল্ম ইনস্টিটিউট স্থাপনের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জনের জন্য তৎকালীন তথ্য ও বেতার মন্ত্রীকে ভারতের পুনা ফিল্ম ও টিভি ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে পাঠানো হয়।

সাংস্কৃতিক চুক্তির অধীনে বিদেশে চলচ্চিত্র শিক্ষার্থী প্রেরণঃ বঙ্গবন্ধুর সরকার সদ্য-স্বাধীন দেশের সাংস্কৃতিক কাঠামো তৈরির জন্য বিদেশে চলচ্চিত্র টেলিভিশন নাটক অভিনয়, সংগীত, নৃত্য ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বন্ধু দেশের সঙ্গে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ ধরনের চুক্তির অধীনে ১৯৭৩-১৯৭৫ সালের মধ্যে চলচ্চিত্র শিক্ষার জন্য ভারতের পুনাস্থ ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে যান সৈয়দ সালাউদ্দীন জাকী (পরিচালনা), বাদল রহমান (সম্পাদনা), আনোয়ার হোসেন (চিত্রগ্রহণ), সাইদুল আনাম টুটুল (সম্পাদনা), শফিকুল ইসলাম স্বপন (চিত্রগ্রহণ), মাকসুদুল বারী (চিত্রগ্রহণ) ও সদরুল পাশা । সৈয়দ সালাউদ্দীন জাকী জানিয়েছেন যে, পুনা ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে যাওয়ার আগে তিনি বঙ্গবন্ধুর আশীর্বাদ নিয়েছিলেন।

পরবর্তীতে বিভিন্ন শিক্ষার্থী চলচ্চিত্র অধ্যয়নের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, পোল্যান্ড, চেকোস্লাভিয়ায় যান। বিদেশে প্রশিক্ষিত এসব ছাত্ররাই পরবর্তীতে দেশে ফিরে চলচ্চিত্র শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অধীনে ফিল্ম ইনস্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ (১৯৭৪)ঃ বঙ্গবন্ধুর সরকার বাংলাদেশের শিল্প ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বিকাশ, চর্চা, শিক্ষা, গবেষণা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্ম সম্পাদনের জন্য ১৯৭৪ সালে জাতীয় সংসদে বিল পাসের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে সংস্কৃতির অংশ হিসেবে চলচ্চিত্রও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অধীনে প্রশিক্ষিত চলচ্চিত্র কর্মী তৈরির লক্ষ্যে একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাও রাখা হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যার পর প্রস্তাবিত ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় ঋদ্ধ মানুষ। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ছিল তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় তিনি চলচ্চিত্রকে গুরুত্ব দিয়ে সেই পাকিস্তান আমলের রুদ্ধ পরিবেশে আইন পাসের মাধ্যমে ১৯৫৭ সালের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী থাকাকালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা। এটা ছিল তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণে দেশকে স্বনির্ভর করে তোলার বাস্তবমুখী পদক্ষেপ।

১৯৭১ সালে তাঁরই নির্দেশনায় রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়। তিনি হন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। চলচ্চিত্রের গুরুত্ব অনুধাবন করে সুদক্ষ কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি ১৯৭২-১৯৭৫ সালে চলচ্চিত্র ইনস্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অন্যদিকে বেসরকারি পর্যায়েও চলচ্চিত্র শিক্ষা এবং ইনস্টিটিউট চালুর মানস কাঠামো তৈরি হয় নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর সরকার চলচ্চিত্র সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন রকম উদার সক্রিয় কার্যক্রম ও নীতি চালুর পরিপ্রেক্ষিতেই চলচ্চিত্র শিক্ষার পরিবেশ তৈরি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে চলচ্চিত্র পঠন-পাঠন শুরু হয় এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০১৩ সালে আইন পাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট।

লেখক: চলচ্চিত্র বিষয়ক গবেষক ও শিক্ষক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ২৬শে মার্চ ২০২১ জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আন্তর্জাতিক 'গান্ধি শান্তি পুরস্কার ২০২০' গ্রহণ করছেন জাতির পিতার কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা। এসময় বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু গান্ধী শান্তি পুরস্কার পেলেন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গান্ধী শান্তি পুরস্কার–২০২০-এ ভূষিত করেছে ভারত সরকার। সে দেশের সংবাদমাধ্যম টাইমস নাউ নিউজের এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ যখন মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন করছে, ঠিক তখন বঙ্গবন্ধুকে সম্মান জানাতে পেরে তারা গর্বিত।

প্রসঙ্গত, অহিংসা ও গান্ধীবাদী আদর্শে আর্থসামাজিক কিংবা রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এই পুরস্কার প্রদান করে ভারত সরকার।

২০২০ সালের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করতে গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, মানবাধিকার ও স্বাধীনতার কাণ্ডারি ছিলেন বঙ্গবন্ধু। ভারতীয়দের কাছেও তিনি নায়ক। বঙ্গবন্ধুর উত্তরাধিকার ও অনুপ্রেরণা দুই দেশের ঐতিহ্যকেও ঋদ্ধ করেছে। তাঁর দেখানো পথেই দুই দেশের বন্ধুত্ব, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ভিত্তি আরো শক্তিশালী হয়েছে।

১৯৯৫ সাল থেকে প্রতিবছর এই পুরস্কার প্রদান করছে ভারত সরকার। সে বছর মহাত্মা গান্ধীর ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তাঁর মতাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই পুরস্কার চালু হয়। পুরস্কারের নগদ অর্থমূল্য এক কোটি রুপি। সাথে একটি স্মারক ও মানপত্র প্রদান করা হয়।

প্রতিবেদন : মো. খালেকুজ্জামান

রমজান ও রোজা

মুহাম্মদ ইসমাঈল

রমজান ও সিয়াম শব্দ দুটির অর্থ

কোরান মাজিদের শব্দ হলো রামাজান ও সিয়াম। আমরা রামাজানকে রমজান এবং সিয়ামকে রোজা বলে থাকি। আমরা কালেমা, সালাত, সিয়াম, হজ ও যাকাতকে সাধারণত একই নামেই বলে থাকি।

রমজান শব্দটি কোরান মাজিদে সূরা বাকারা ১৮৫ নম্বর আয়াতে এক বার মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে। আর রোজা (সাওম) শব্দটি ১৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতগুলো হলো সূরা বাকারা-১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭, ১৯৬, ১৯৬; সূরা মরিয়ম-২৬; সূরা নিসা-৯২; সূরা মায়েদা-৮৯, ৯৫; সূরা মুজাদালা-৪; সূরা আহযাব-৩৫, ৩৫।

আরবি শব্দ রম্‌জ্‌ থেকে রমজান শব্দটি এসেছে। রম্‌জ্‌ শব্দটির অর্থ জ্বালিয়ে দেওয়া বা পুড়িয়ে দেওয়া। পবিত্র রমজান মাসে মুমিনদের গুনাহ খাতা রোজা রাখার মাধ্যমে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সাফ করে দেয় বিধায় এ মাসটির নাম রমজান মাস রাখা হয়েছে। আরবি ক্যালেন্ডারে রমজান মাসটি নবম মাস। শাবান মাসের পরই রমজান মাস শুরু হয়। শাবান মাসের চাঁদ শেষ হলেই রমজানের চাঁদ ওঠে, চাঁদ ওঠলেই রোজা রাখতে হয়।

রোজা ফরাসি শব্দ। আরবি শব্দ সিয়াম যার অর্থ বিরত থাকা। রোজার দিনে দিনের বেলায় পানাহার ও স্ত্রী ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হয় বিধায় রোজাকে সিয়াম বলা হয়েছে। রোজার দিনে আল্লাহর হুকুমে দিবাভাগে হালাল জিনিস খাওয়াও হারাম।

রমজানের বৈশিষ্ট্য

রমজান মাস মুসলমানের জন্য আল্লাহর বিরাট নেয়ামত। এ মাস কল্যাণ ও সৌভাগ্যপূর্ণ। এটি হচ্ছে নেক কাজের মওসুম। এই মওসুমে নেক কাজ করার সুযোগ অনেক বেশি। তাই একজন মোমিন নিজে ঈমান ও আমলকে উন্নত করার জন্য ১১ মাস অপেক্ষা করে। যারা বেশি বেশি নেক কাজ করে এই মাসকে কাজে লাগাতে পারে, তারা কতই না সৌভাগ্যবান! পক্ষান্তরে, যারা এই মাসকে কাজে লাগাতে পারে না, তারা অবশ্যই হতভাগ্য।

রোজার ফজিলত

রমজানের রোজার ফজিলত অনেক। ইসলামে যে সকল এবাদতের সওয়াব ও পুরস্কার সর্বাধিক তারমধ্যে রমজানের রোজা অন্যতম। অন্য কোনো এবাদতের ফজিলত এত বেশি কমই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: 'যে ঈমান ও এহতেছাবের সাথে সওয়াবের নিয়তে রমজানের রোজা রাখবে আল্লাহ তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন।' (বোখারী ও মুসলিম)

যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে

'আদম সন্তানের প্রতিটি নেক কাজের জন্য ১০ থেকে ৭শ গুণ পর্যন্ত সওয়াব নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ বলেন, রোজা এর ব্যতিক্রম। সে একমাত্র আমার জন্যই রোজা রেখেছে এবং আমিই নিজ হাতে এর পুরস্কার দেবো। সে আমার জন্যই রোজা রেখেছে এবং আমিই নিজ হাতে এর পুরস্কার দেবো। সে আমার জন্যই যৌন বাসনা ও খানা-পিনা ত্যাগ করেছে। রোজাদারদের রয়েছে দুইটা আনন্দ। একটা হচ্ছে ইফতারের সময় এবং অন্যটি হচ্ছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। আল্লাহর কাছে রোজাদারদের মুখের গন্ধ মেশক-আম্বরের সুঘ্রাণের চাইতেও উত্তম।' (বোখারী ও মুসলিম)

এক নজরে রমজান ও রোজা

১. রমজান মাসের একটি নফল আদায় অন্য মাসের একটি ফরজ আদায়ের সমান (বায়হাকী)

২. রমজান মাসে একটি ফরজ আদায় অন্য মাসে সত্তরটি ফরজ আদায়ের সমান। (বায়হাকী)

৩. রমজান সবরের মাস, আর সবরের বিনিময় জান্নাত। (বায়হাকী)

৪. রমজান পারস্পরিক সহানুভূতি প্রকাশের মাস। (বায়হাকী)

৫. রমজান মাসে মুমিনের রিজিক বৃদ্ধি পায়। (বায়হাকী)

৬. রোজাদারকে ইফতার করালে সমান পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে অথচ রোজাদারের সওয়াব কাটা হবে না। (বায়হাকী)

৭. রোজাদারকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়ালে হাউজে কাউসারের পানি পান করতে পারবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত পিপাসা লাগবে না।

৮. রমজানের প্রথম দশক রহমত, দ্বিতীয় দশক মাগফিরাত এবং শেষ দশক জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের।

৯. জান্নাতে আটটি গেটের মধ্যে একটির নাম রাইয়ান যে গেট দিয়ে রোজাদার ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। (বোখারী ও মুসলিম)

১০. ঈমান ও আত্মসমালোচনার সাথে (নেকি লাভের আশায়) ইবাদত করলে পূর্বের গুনাহ খাতা মাফ হয়ে যাবে। (বোখারী ও মুসলিম)

১১. রোজাদারের জন্য দুটি সময় খুশির- একটি হলো ইফতার করার সময়, অন্যটি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। (বোখারী ও মুসলিম)

১২. রোজা সুপারিশ করে বলবে, হে আল্লাহ, আমি তাকে পানাহার ও প্রবৃত্তির দাবি পূরণে বাধা দিয়েছি, তারজন্য আমার সুপারিশ কবুল করুন। কোরান বলবে, হে আল্লাহ আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বাধা দিয়েছি, তারজন্য আমার সুপারিশ কবুল করা হবে। (বায়হাকী)

১৩. রোজাদার ইফতার না করা পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য গুনাহ মাফের দোয়া করতে থাকে।

১৪. এ মাসে বড়ো বড়ো শয়তানদেরকে শিকল দিয়ে বাধা হয়।

১৫. রমজানের প্রতি রাত্রে রোজাদারদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৬. রমজান মাস বেশি দান সাদকা করার মাস।

১৭. রমজান মাস কোরান নাযিলের মাস।

১৮. রমজান মাস কোরান বিজয়ের মাস।

১৯. রমজান মাসের ওমরা একটি হজের সমান।

২০. রোজাদার ব্যক্তি শ্রমিকদের মতোই শেষ রমজানে পারিশ্রমিক লাভ করে।

২১. শাওয়ালের মাসের ৬ নফল রোজা রাখলে পূর্ণ বছরের সওয়াব পাওয়া যায়।

২২. শেষ রাতের সেহরি (খাবার) বরকতময়।

২৩. তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ-এর কিয়াম দ্বারা অতীতের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

২৪. রোজার ত্রুটি মুক্ত করার জন্য ফিতরা আদায় করা হয়।

২৫. রমজানে শারীরিক রোগ-ব্যাধি দূর হয়ে যায়।

২৬. রোজা রাখলে নিন্দা গীবত চর্চা বন্ধ হয়ে যায়।

২৭. রমজানে তওবার দ্বারা গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

২৮. রমজানে ক্ষুধা-পিপাসার ব্যথা অনুভবে মমত্ব ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়।

২৯. রমজানের রোজার পুরস্কার আল্লাহ তায়ালা ঈদের দিনে দিয়ে খুশি করেন।

৩০. সমুদ্রের মাছও রোজাদারের জন্য দোয়া করে।

৩১. রমজানে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি হয়।

রোজার প্রকারভেদ

ইসলামের বিধি অনুযায়ী রোজা চার প্রকার। যেমন : ১. ফরজ, ২. ওয়াজিব, ৩. সুন্নত, ৪.নফল। না বোধক রোজা দু'প্রকার। যেমন: ১. মাকরূহ ও ২. হারাম।

ফরজ রোজা : মান্নত ও কাফ্ফারার রোজা ওয়াজিব।

সুন্নত রোজা : নবি করিম (সা.) নিজে যে রোজা পালন করেছেন এবং উম্মতকেও পালন করতে বলেছেন, তাই সুন্নত রোজা এর মধ্যে রয়েছে– ১. আশুরার রোজা, মুহাররম মাসের নয় ও দশ তারিখ, ২. আরাফার দিনের রোজা, ৩. আইয়্যামে বীযের রোজা। অর্থাৎ প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখের রোজা।

নফল রোজা : উক্ত তিন প্রকার বাদে বাকি সকল ইতিবাচক সাওমই নফল রোজা। যেমন- শাওয়াল মাসের ছয়টি ও অন্যান্য রোজা।

মাকরূহ রোজা : কেবলমাত্র শনিবার কিংবা রবিবার রোজা পালন করা মাকরূহ। আশুরার দিনে শুধু একটি রোজা মাকরূহ। স্বামীর অনুমতি ছাড়া নারীর নফল রোজা মাকরূহ।

হারাম রোজা : বছরের পাঁচ দিন রোজা পালন করা হারাম। ১. ঈদুল ফিতরের দিন, ২. ঈদুল আজহার দিন, ৩. আইয়্যামে তাশরিকের দিনসমূহ অর্থাৎ ১১, ১২, ১৩ই জিলহজ।

যারা রমজান মাসে রোজা ভাঙতে পারে

১. **রোগগ্রস্ত :** কোনো ব্যক্তি রমজান মাসে রোগগ্রস্ত হলে রোজা ভাঙতে পারে। তবে পরবর্তীতে সেগুলো কাযা করতে হবে।

২. **মুসাফির :** কেউ যদি রমজান মাসে কসর নামায পড়ার দূরত্বে সফর করে, তবে সে রোজা ভাঙতে পারে। তাকেও পরবর্তীতে কাযা করতে হবে।

৩. **নিফাস ও ঋতুবতী :** সন্তান প্রসবের পর এবং মাসিক চলাকালে মহিলারা রোজা ভাঙবে। তবে পরবর্তীতে কাযা করতে হবে।

৪. **গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণী :** বড়ো ধরনের স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা থাকলে মহিলারা রোজা ভাঙতে পারে এবং প্রতিটি রোজার জন্য একজন মিসকিন খাওয়াতে হবে।

৫. **অক্ষম :** বৃদ্ধ বয়স বা এমন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যার সুস্থ হয়ে উঠার আশা নেই, এমন ব্যক্তিরা রোজা ভেঙে প্রতিটি রোজার জন্য একজন মিসকিন খাওয়াতে পারে।

মাহে রমজানের দিবসসমূহ

১। ১লা রমজান বড়ো পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রা.)-এর জন্ম দিবস।

২। ৩রা রমজান মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর ওপর সহিফা অবতীর্ণ হয়।

৩। ৬ই রমজান হযরত মুসা (আ.)-এর ওপর আসমানি কিতাব তাওরাত অবতীর্ণ হয়।

৪। ১০ই রমজান হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকাল হয়।

৫। ১৩ই রমজান হযরত ঈসা (আ.)-এর ওপর ইঞ্জিল কিতাব অবতীর্ণ হয়।

৬। ১৭ই রমজান ইসলামের ইতিহাসের প্রথম হক ও বাতিলের সাথে বদর যুদ্ধ হয়।

৭। ১৮ই রমজানে হযরত সাউদ (আ.) এর ওপর আসমানি কিতাব যাবুর অবতীর্ণ হয়।

৮। ১৯ই রমজান মক্কা বিজয় হয়। এবং এই দিনে হযরত আলী (রা.) আততায়ীর ছুরিকাঘাতে আহত হন।

৯। ২১শে রমজান হযরত আলী (রা.) শাহাদতবরণ করেন।

১০। ২১শে রমজান থেকে ২৯শে রমজান পর্যন্ত বিজোড় রাতসমূহে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান।

[বি.দ্র. লাইলাতুল কদরে পবিত্র কোরান মাজিদ অবতীর্ণ হয়]

রমজান আসে রমজান যায়। আমরা যেন রমজানের প্রত্যেকটি হুকুম আহকাম মেনে চলতে পারি– আল্লাহর দরবারে আমাদের এই প্রত্যাশা। মহান আল্লাহ যেন কবুল করেন। আমিন।

লেখক: শিক্ষক, কবি ও প্রাবন্ধিক

বঙ্গমাতা জাদুঘর ও বঙ্গবন্ধু কর্নার

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে ২৯শে মার্চ রাজধানীর বেইলি রোডে জাতীয় মহিলা সংস্থায় বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা স্মৃতি জাদুঘর ও বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্‌বোধন করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। এর মাধ্যমে জাতীয় মহিলা সংস্থায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জীবন, কর্ম ও আদর্শের ওপর বই, ছবি, ভিডিও ডকুমেন্টারি ও বিভিন্ন বিষয়ে সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা তৈরি করা হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা আজীবন নারীর ক্ষমতায়ন ও সমতা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন। তিনি সংবিধানে নারীর অধিকার নিশ্চিত করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসনের জন্য নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য কুটিরশিল্পসহ কর্মমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। বঙ্গমাতা নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। বঙ্গমাতা জাতির পিতার বিশ্বস্ত সহচর ও সাহসী শক্তি হয়ে আজীবন পাশে ছিলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর রয়েছে অপরিসীম অবদান। এ জাদুঘর ও কর্নারের মাধ্যমে বঙ্গমাতা ও বঙ্গবন্ধুর জীবন, আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে পরবর্তী প্রজন্ম।

প্রতিবেদন : প্রভাষ চন্দ্র

মুজিববর্ষে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর উপহার

আবু সালেহ মোহাম্মদ মুসা

মুজিববর্ষে উদ্‌বোধন হবে অন্তত পক্ষে ১৭০টি মডেল মসজিদ। ২০১৪ সালের নির্বাচনি ইশতাহারের আরো একটি বড়ো প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। পদ্মা সেতুর পর সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রকল্প এটি। প্রাথমিকভাবে এ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৮ হাজার ৭২২ কোটি টাকা। সারা দেশে দ্রুত গতিতে নির্মাণকাজ এগিয়ে যাচ্ছে। শিঘ্রই ৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উদ্‌বোধন হবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান।

বর্তমান সরকার প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র করার প্রতিশ্রুতি দেয় ২০১৪ সালের নির্বাচনি ইশতাহারে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়নে সবসময় বদ্ধপরিকর। এরই ধারাবাহিকতায় একে একে ৫৬০টি মডেল মসজিদের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এ বছরই ১৭০টির কাজ শেষ হবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা করছে।

জেলা সদরে মসজিদগুলো হবে একটি আধুনিক ইসলামি সেন্টার– এখানে নামাজ আদায়, ইসলামি লাইব্রেরি, প্রশিক্ষণ, ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ডরমেটরি সবই থাকবে। লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসলমান এসব মসজিদে একান্তে আল্লাহর ইবাদত করবেন। প্রতিবছর অন্তত পক্ষে ১৪ হাজার হাফেজ তৈরি হবে, প্রকৃত ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত হবে মানুষ, ধর্মের নামে অপপ্রচার বন্ধ হবে।

সরকার তিন ক্যাটাগরিতে মসজিদ নির্মাণ করছে। 'এ' ক্যাটাগরিতে চারতলা বিশিষ্ট মডেল মসজিদ নির্মিত হচ্ছে ৭৯টি। চারটি সিটি করপোরেশন এবং ৬৪টি জেলা শহরে এগুলো নির্মিত হচ্ছে। প্রকল্পের নকশা অনুযায়ী মডেল মসজিদের জন্য ৪০ শতাংশ জায়গায় জেলা পর্যায়ে চারতলা ও উপজেলার জন্য তিনতলা এবং উপকূলীয় এলাকায় চারতলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। এসব চারতলা মসজিদে একসঙ্গে এক হাজার দুইশ জন মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারবেন। প্রকল্পের কাজ ২০১৭ সালের এপ্রিল থেকে ২০২০ সালের ডিসেম্বর মেয়াদে অনুমোদিত হলেও সৌদি অর্থায়ন নিয়ে নানা জটিলতার কারণে নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়ন শুরু করা যায়নি। প্রধানমন্ত্রীর সাহসী উদ্যোগে ২০১৮ সালে সরকারি অর্থায়নে সংশোধিত প্রকল্পটি শুরু করা হয়, যার মেয়াদ চলতি বছরের জুন পর্যন্ত। কাজ শুরু করতে দেরি হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন ধর্ম মন্ত্রণালয় হয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হচ্ছে।

চারতলা 'এ' ক্যাটাগরির ৭৯টি মসজিদের আয়তন হবে দুই লাখ ৮১ হাজার ৫৮৪ বর্গমিটার। আর তিনতলা 'বি' ক্যাটাগরির ৪৭৬টি মসজিদের আয়তন হবে এক লাখ ৬৪ হাজার ৭৪২ বর্গমিটার। 'সি' ক্যাটাগরির মসজিদ হবে ১৬টি যার আয়তন হবে ৬১ হাজার ২৫ বর্গমিটার। উপকূলীয় এলাকার মসজিদগুলোতে নিচতলা ফাঁকা থাকবে, যা সাইক্লোন শেল্টার হিসেবে ব্যবহার হবে।

উপজেলা পর্যায়ে তিনতলা মসজিদে একসঙ্গে নয়শ মুসল্লির নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া ইসলামি লাইব্রেরি, ইমাম ট্রেনিং সেন্টার, ইসলামি গবেষণা, হেফজখানা, মরদেহ গোসল, হজ নিবন্ধন, অটিজম কর্নার, শিশু ও গণশিক্ষা, ইমাম-মুয়াজ্জিনের আবাসন, অতিথিশালাসহ ১৪ ধরনের সুবিধা থাকবে পূর্ণাঙ্গ এই মসজিদে।

এসব মসজিদে সর্বমোট প্রায় পাঁচ লাখ পুরুষ ও ৩২ হাজার নারী একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারবেন। লাইব্রেরিতে ৩৪ হাজার পাঠক একসঙ্গে কোরান ও ইসলামিক বই পড়ার পাশাপাশি প্রায় সাত হাজার জনের জন্য থাকবে ইসলামিক গবেষণার সুযোগ। প্রাথমিক শিক্ষা পাবে পৌনে দুই লাখ শিশু। সর্বোপরি ইসলামি জ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে ইসলামি মূল্যবোধ বিনির্মাণে এক একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে উঠবে এসব মসজিদ। ইমাম-মুয়াজ্জিনের আবাসনসহ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অফিসের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ধর্মের অপব্যাখ্যা, বিভ্রান্তি দূর করতে প্রকৃত ইসলামি মূল্যবোধের সৃষ্টি ও প্রসারে শক্তিশালী ইসলামি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়তে বিশেষ ভূমিকা রাখবে এসব মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও সাহসী পদক্ষেপে স্বাধীনতার পর দেশে একসঙ্গে এত মসজিদ নির্মাণের ঘটনা এটিই প্রথম। ধর্মের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর ভালোবাসার এ এক উজ্জ্বল নির্দশন।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট

বাংলা নববর্ষের পূর্বাপর

খান চমন-ই-এলাহি

কৃষ্টি-সংস্কৃতি এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ আমাদের নেই। জন্ম থেকে বিকাশের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে আমাদের সাক্ষাৎ হয় সভ্যতার সঙ্গে কিংবা সভ্যতার মোড়কে আমরা পরিণতির দিকে প্রকাশিত হই। আমরা যেভাবেই বলি না কেন, মানুষ সমাজ-রাষ্ট্রের অধীন। আবার সমাজ-রাষ্ট্রের সীমা-বিস্তৃতি, পরিচিত ও মূল্যায়ন ও মানুষের যোগ্যতায় হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। কোনোটিই খুব সহজ নয় আবার এমন কঠিন নয় যে, বদলাবে না, ভাঙবে না এবং নতুনভাবে নির্মাণও সম্ভব হবে না। অসাধ্য সাধন করে মানুষ। গতকাল যা অজানা ছিল আজ তা জানার মধ্যে, জ্ঞানের মধ্যে এবং আগামী জানার ফলে একদিন তা পেছনের ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাঙালি, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশ নিয়ে সভ্যতা-সংস্কৃতির অহংবোধ প্রাণের, স্পর্শের এবং বাইরের জগতের। সে কারণে এসবের সঙ্গে আমরা প্রত্যেকেই এক ও অভিন্ন।

বাংলা নববর্ষ সংস্কৃতির বাহন। হয়ত কেউ কেউ বলবেন এটা একটি দিক মাত্র। আবার কেউ এর মধ্যে অনেক বৈশিষ্ট্য বা উপাদান খুঁজে পাবেন। কারো পাওয়া বা না পাওয়ায় সংস্কৃতির বহমান নদী থমকে যাবে না। স্রোত আটকে যাবে না। সে থাকবে জাগ্রত। সতত বহমান, খরস্রোতা নদীর মতো এগিয়ে যাবে। যদি তাই না হতো তাহলে নববর্ষের উৎসব কোনো না কোনো জায়গায়, কারো না কারো বাধায় আটকে যেত। কিন্তু উন্মীলিত চোখ দেখে, সে কখনো আটকে না, সে শুধুই অগ্রসর হয়। কারণ সংস্কৃতি বা উৎসব স্বাধীনতার মতো অন্তরে-বাইরে বিরাজমান। দৃশ্যে-অদৃশ্যে এর প্রয়োজন অফুরান। হয়ত সেজন্য হিজরি নববর্ষের মতো, ইরানের নওরোজের মতো কিংবা বহুল প্রচলিত প্রচারিত থার্টি ফার্স্ট নাইটের মতো বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণের গল্প শোনায়। শেখায় উজ্জীবনের গান।

সৌর বর্ষ, চন্দ্র বর্ষ এবং আন্তর্জাতিক রীতিসিদ্ধ সময়ানুযায়ী বর্ষের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সূর্যোদয় ও চন্দ্রোদয়ের সময় ধরে সকাল-সন্ধ্যার সময়ে দিন গণনা বা বর্ষ গণনার শুভ সূচনা হতে পারে। মধ্যরাত বা ১২.০০ টার সময় বা শূন্য ধরে সময় গণনা শুরু হয়। থার্টি ফার্স্ট নাইট সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাঙালির সর্বজনীন উৎসব বৈশাখের উৎসব সে সত্যকে ধারণ করে। রাজা শশাঙ্কের যুগে ৭ম শতকেই হোক কিংবা তারও আগের খ্রিষ্টপূর্ব সময়ের হোক তাতে তেমন কিছু আসে যায় না। বিবর্তিত, পরিবর্তিত হোক বা না হোক, নতুন করে সদ্যোজাত ভূমিষ্ঠ শিশুর মতোই হোক বাংলা নববর্ষ নিয়ে বিতর্কের কিছু নেই। সে বলতে চায়, প্রমাণ এবং যুক্তি প্রদর্শন করে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, দিল্লির মুসলিম মোগল সম্রাট আকবরই বাংলা সনের প্রবর্তন করেন খাজনা, মাশুল ও শুল্কের জন্য। হ্যাঁ, অবশ্যই ফসলি সন বা খাজনা আদায়ের সন পরিশীলিত পরিবর্তিত রূপে বঙ্গাব্দ হয়েছে। তা খুশির এজন্য যে, বাঙালির জীবনে নববর্ষ বা সূচনা দিনের উৎসব পরস্পরের আদান-প্রদান পুরানো। সাম্য-মৈত্রী ও অসাম্প্রদায়িকতার জন্য এর কোনোই বিকল্প নেই।

হয়ত বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের কথা এলে মনে হবে বিশাল ভারতের ঐক্যের প্রতীক দিল্লির মুসলিম মোগল শাসক সম্রাট আকবরের সিংহাসনে আরোহণের দিনের কথা। চমৎকার সেদিনটি ফিরে আসে খেলাফায়ে রাশেদিনের অন্যতম, ইসলামের

দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.)-এর প্রবর্তিত হিজরি সন থেকে। মুসলমানদের কাছে পবিত্র এ হিজরি সন চন্দ্র বা চাঁদ উঠার সাথে সম্পৃক্ত। মুসলিম ধর্মচর্চা তো আছেই, এছাড়াও অনেক দেশে হিজরি সন সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগিক বিষয়। জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কিন্তু ফসলি সনের ক্ষেত্রে বাংলায় এর ব্যবহার জটিল হয়ে ওঠে। আকবরের খাজনা আদায়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়। নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা সংগ্রহ করা যায় না। কারণ হিজরি সন চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় সৌর বর্ষের সঙ্গে ১১/১২ দিনের ব্যবধান তৈরি হয়। দিন গণনার এ জটিলতা থেকে মুক্তির জন্য বঙ্গাব্দের শুভ সূচনা করেন সম্রাট আকবরের বিচক্ষণ, জ্ঞানী, পণ্ডিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফতেহউল্লাহ সিরাজী। তিনি হিজরি সন ও ভারতীয় এ অঞ্চলের বাংলায় এবং আজকের বাংলাদেশে ১৫৮৪ সালের ১০ বা ১১ই মার্চ বাংলা সনের প্রবর্তন নিশ্চিতকরণে এবং আকবরের সিংহাসনে আরোহণের দিনটিকে স্মরণীয় ও বরণীয় করে রাখার জন্য ১৫৫৬ সালের ৫ই নভেম্বরকে বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন চিহ্নিত করেন। সেই থেকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। তবে আমাদের বাংলা সনে বেশ একটু পরিবর্তন লক্ষণীয়। চন্দ্র বর্ষ লীন হয়ে কিংবা নতুন মোড়কে সৌর বর্ষে এসে নতুনভাবে পরিচিতি লাভ করে। আবার কাল প্রবাহে বাংলাদেশ থেকে বাংলাভাষী পার্শ্ববর্তী এলাকায় বা অঞ্চলে দিনের হ্রাস-বৃদ্ধির তারতম্য রয়েছে। এক ও অভিন্ন হয়ে ওঠেনি। আবার সকালের সূর্যোদয়ের হিসাব অনুযায়ী না করে বাংলা একাডেমির সিদ্ধান্ত বলে ১৪০২ বঙ্গাব্দ থেকে রাত ১২টা থেকে সময়ের হিসাব বা বাংলা সন শুরু। তবে বাংলা অঞ্চলে মুর্শিদ কুলি খান সম্রাট আকবরের নীতি কার্যকরে ভূমিকা রাখেন।

তারিখ-ই-ইলাহি বাংলা সনের মূল নাম বা আকবর প্রবর্তিত সনের পরিচিতিমূলক নাম। এ তারিখ-ই-ইলাহির বারো মাসের নাম ছিল কারবাদিন, আর্দি, বিসুয়া, কোর্দাদ, তীর, আর্মাদাদ, শাহরিয়ার, আবান, আজুর, বাহাম ও ইস্কান্দার মিজ। তবে উল্লেখিত নাম বাঙালির জীবনে প্রভাব ফেলতে পারেনি। আমাদের কাছে চমৎকার ও সহজ সাবলীল নাম এসেছে। যা এ অঞ্চলের মাটি ও মানুষের ভাবনার সাথে যায়। কী চমৎকার এখন বাংলা বারো মাসের নাম। আকাশের নক্ষত্র মানুষের মুখের ভাষায়। নক্ষত্র বিশাখা থেকে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা থেকে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়া থেকে আষাঢ়, শ্রবণা থেকে শ্রাবণ, ভাদ্রপদ থেকে ভাদ্র, অশ্বিনী থেকে আশ্বিন, কৃত্তিকা থেকে কার্তিক, পুষ্য থেকে পৌষ, মঘা থেকে মাঘ, ফাল্গুনী থেকে ফাল্গুন ও চিত্রা থেকে চৈত্র। শুধু অগ্রহায়ণ মাসটি নক্ষত্রের নামে নয়। 'হায়ণ' অর্থ বছর। অগ্রহায়ণ মানে বছরের শুরু।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি বঙ্গাব্দের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বাঙালির নিজস্ব অব্দ নিয়ে কাজ করেছেন। পরিশেষে আধুনিকায়নের জন্য ১৯৬৬ সালের সিদ্ধান্তকে আরো কার্যকর করতে বাংলা একাডেমি ১৯৮৭ সালে এমন এক দিনপঞ্জিকা গ্রহণ করে, যেখানে ১৪ই এপ্রিল পহেলা বৈশাখ, পরবর্তীতে আরো একধাপ সংস্কার করে গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জির সাথে মিল করতে বৈশাখ থেকে আশ্বিন ছয় মাস ৩১ দিনে হবে। ফাল্গুন মাস ২৯ দিনে, শুধু অধিবর্ষ হলে ৩০ দিন এবং বাকি মাস ৩০ দিনে হবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যদের কল্যাণে যে প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয় সেখানেও হোম কীর্তন ও পূজার ব্যবস্থা ছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে হালখাতা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে। বাংলাদেশেও সনাতন ধর্মে বিশ্বাসীদের অনেকে এদিন মঙ্গলদাত্রী লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশের আরাধনা করেন। বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি-মৈত্রী-ভ্রাতৃত্ব ও অসাম্প্রদায়িকতার জায়গা দখল করেছে। ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁক অতিক্রম করে পাকিস্তান আমলে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন নতুন মাত্রা পায়। ১৯৬৭ সালে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান সূচনার পর অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগোয় বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগ ও বিশেষ ভূমিকায় বর্ষবরণ অনুষ্ঠান অসামান্য উচ্চতায় পৌঁছে। জাতীয় উৎসবের মর্যাদায় সিক্ত হয়। আর পুরানো যুগের মেলা, নৌকাবাইচ, গ্রামীণ খেলা কিংবা পূজারির প্রার্থনাতো রয়েছেই। মঙ্গল শোভাযাত্রা ও মুখোশ প্রদর্শন এখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নান্দনিকতার প্রকাশ ঘটাচ্ছে। নববর্ষের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সরকার বোনাসের ব্যবস্থা রেখেছে। যাতে সরকারি চাকরিজীবীরা ছাড়াও সাধারণ মানুষের মধ্যে এর প্রভাব পড়ে। সংস্কৃতির বন্ধন জোরদার হয়।

১লা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। বঙ্গাব্দের সূচনা দিন। এদিন জাতির ইতিহাসের অনন্য দিন। এখানকার মাটি ও মানুষের সম্পর্ক বহিঃপ্রকাশের দিন, সকল মতের মানুষের মিলনের দিন, সাড়া জাগানো দিন। একে অন্যে ভালোবাসার দিন। পুরাতন ভুলে নতুন গ্রহণের দিন। হালখাতার দিন। সত্য-সুন্দরকে আলিঙ্গন করার দিন। আবার নতুনভাবে জাতীয় চেতনায় এগিয়ে যাবার দিন। নিশ্চয়ই বাঙালি ও বাংলাদেশের মানুষ ভালোবাসায় এগিয়ে যাবে।

লেখক : সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও আইনজীবী

বঙ্গবন্ধু জীববৈচিত্র্য ঐতিহ্য হালদা নদী

রুই জাতীয় মাছের প্রজননের জন্য দেশের সর্ববৃহৎ নদী হালদাকে 'বঙ্গবন্ধু জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ঐতিহ্য হালদা' ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ১৮ই মার্চ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রথম সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭ অনুযায়ী গঠিত জাতীয় জীববৈচিত্র্য কমিটি জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ ও ঘোষণার জন্য পরামর্শ প্রদান এবং ঘোষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিয়মিত নির্দেশনা প্রদান করবে। মন্ত্রী বলেন, এ সিদ্ধান্তের ফলে হালদা নদীতে কার্প জাতীয় মাছের প্রজনন নির্বিঘ্ন, ডলফিন সুরক্ষা, দূষণ কমানোসহ সামগ্রিক জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ সহজ করতে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য সরকার দায়বদ্ধ। এছাড়াও জাতিসংঘের জীববৈচিত্র্য সনদ অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উহার উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহার, জীবসম্পদ ও তদসংশ্লিষ্ট জ্ঞান ব্যবহার করে প্রাপ্ত সুফলের সুষ্ঠু ও ন্যায্য হিস্যা বণ্টন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার কাজ করছে।

প্রতিবেদন : শুভ আহমেদ

করোনাকালে নববর্ষের প্রার্থনা

শামসুজ্জামান শামস

আবহমানকাল থেকে পালিত হয়ে আসা এক আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরম্পরার বৈশাখেও করোনাভাইরাস সংক্রমণ ও বিস্তার মানুষকে বাধ্য করছে নতুনতর আচরণ ও সংস্কৃতিতে। তারপরও আমরা আবহমানকালের সংস্কৃতি মেনেই সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে চাই। আমরা জানি, বৈশাখের উদ্‌যাপনে নতুন মাত্রা যোগ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের মঙ্গল শোভাযাত্রা এবং রমনার বটমূলে ছায়ানটের গানের আসরসহ অন্যান্য আয়োজন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালে বৈশাখি উৎসব বন্ধ ছিল। করোনার কারণে গত দুবছর ধরে একই অবস্থা বিরাজ করছে। গত বছরের মতো এ বছরও বৈশাখের আয়োজন সীমিত পরিসরে অনলাইনে হয়েছে। আয়োজনের ধরন যা-ই হোক, পরিস্থিতি যেমনই হোক, সময়ের বিবর্তনে বৈশাখ আসছে।

বৈশাখ পুরনো জরাজীর্ণকে ঝেড়ে ফেলে আমাদের যাপিত জীবনে নতুন সম্ভাবনা ও নতুন প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলতেই শুধু নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে একাকার হওয়ার প্রেরণাও জোগায়। তাই পহেলা বৈশাখই হচ্ছে বাঙালির জীবনে সবচেয়ে বড়ো অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন উৎসব।

বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস হাজার বছরের। সমৃদ্ধ এই সংস্কৃতির সঙ্গে বর্ষবরণ উৎসব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পহেলা বৈশাখ বাঙালি ঐতিহ্যের অহংকার। 'ওই নতুনের কেতন ওড়ে কালবোশেখি ঝড়, তোরা সব জয়ধ্বনি কর'– কবির এ বাণী হৃদয়ে ধারণ করে, পুরনো জরা ও গ্লানি ঝেড়ে ফেলে বাঙালি নতুন বছরকে বরণ করে নেয়। পুরাতন বছরের জরা, ক্লান্তি, গ্লানিকে পেছনে ফেলে চির নতুনের আহ্বান নিয়ে বছর ঘুরে আসে পহেলা বৈশাখ। করোনা সংক্রমণের কারণে গত বছর বৈশাখি উৎসব আমাদের পক্ষে পালন করা সম্ভব হয়নি। এ বছর মাঝের কয়েকটি মাস করোনা সংক্রমণ কিছুটা কমে যাওয়ায় এবং জনজীবন অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে মনে হওয়ায় অনেকেই এ বছর পহেলা বৈশাখের উৎসব নিয়ে নানারকম পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে করোনা পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করায় সব পরিকল্পনা ভেস্তে গিয়েছে। তারপরও করোনা দুর্যোগের মধ্যে আমরা স্বাগত জানাই নতুন বঙ্গাব্দ ১৪২৮। এ দুর্যোগ বাংলাভাষী তো বটেই, গোটা বিশ্বকেই নাড়িয়ে দিয়েছে। এক বছরের অধিক সময় ধরে চলা এ দুর্যোগের মধ্যেও আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিকূলতা মোকাবিলা করেও বাংলা নতুন বছরের সূর্যোদয় দেখবে বাংলাদেশের মানুষ। যদিও পরিস্থিতির নতুন সমীকরণে বৈশাখের প্রথম দিন থেকেই দেশব্যাপী সরকার সর্বাত্মক লকডাউনের ঘোষণা দিয়েছে। তাই অদৃশ্য জীবনবিনাশী শক্তির বিরুদ্ধে ঘরে থাকার প্রধান কৌশলে বাইরের আয়োজন চার দেয়ালের মধ্যে নিয়ে আসাই মঙ্গল। বাতাসে কিংবা ইথারে কিংবা ইন্টারনেটে ভেসে আসা কল্লোলে কণ্ঠ মিলিয়ে বাঙালি গেয়ে উঠবে– 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো।'

এবার পহেলা বৈশাখ থেকে সারা দেশে লকডাউন শুরু হচ্ছে। আমরা যার যার জায়গা থেকে সচেতন হই। সামাজিক দূরত্ব মেনে চলি। আমরা চাইলে একটু ভিন্নভাবে নিজেদের মতো করে ঘরেও পালন করতে পারি পহেলা বৈশাখে। পুরনো বছরের জরাজীর্ণকে পেছনে ফেলে নতুন করে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প নেবে বাঙালি। বাংলা নববর্ষ সামনে রেখেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাণে বেজেছে– 'মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,/ অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।' এই সুর মূর্ছনা আজও দল ও মত নির্বিশেষে সব বাঙালি হৃদয়ে দোলা দেবে। তবে বিদ্যমান কঠিন বাস্তবতায় আমরা প্রত্যাশা করি, মহামারিমুক্ত হয়ে সারা বিশ্ব শুচি হবে।

রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য মোগল সম্রাট আকবরের আমলে বৈশাখ থেকে প্রবর্তন হয়েছিল বাংলা সালের। বর্ষ শুরুর সেই দিনটিই এখন বাংলাদেশিদের প্রাণের উৎসব। বাদশাহ আকবরের নবরত্ন সভার আমির ফতেহউল্লাহ সিরাজী খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য ফসলি সালের শুরু করেছিলেন হিজরি চান্দ্রবর্ষকে বাংলা সালের সঙ্গে সমন্বয় করে। তিনি পহেলা বৈশাখ থেকে বাংলা নববর্ষ গণনা শুরু করেছিলেন। আর বৈশাখ নামটি নেওয়া হয়েছিল নক্ষত্র 'বিশাখা'র নাম থেকে। আবহমান বাংলার হাজার বছরের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বাঙালি বরণ করে নতুন বছরকে। বৈশাখের প্রথম দিবসটি আবহমানকাল থেকেই আমাদের সত্তায়, চেতনায় ও অনুভবের জগতে এক গভীরতর মধুর সম্পর্ক নিয়ে বিরাজ করছে। বাঙালির জীবনে ঐতিহ্যের রং আর রূপ নিয়ে আসে পহেলা বৈশাখ। গোটা দেশ এদিন মেতে ওঠে উৎসব আয়োজনে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একটি জাতি তার মূল পরিচয় ধরে রাখে।

ষড়ঋতুর দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। এই ছয় ঋতুর দেশে বৈশাখ প্রথম মাস। এই মাস কালবৈশাখির প্রলয় নৃত্য নিয়ে চারদিক জানান দিয়ে আসে। আসে বাংলা নববর্ষ। বিচিত্র জীবনবোধ ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যময়তায় বর্ষবরণ সর্বজনীন সংস্কৃতি, একই সুর ও সংগীতে, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিতে এবং মনের মেলবন্ধনে বৈশাখ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বাঙালির হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। পহেলা বৈশাখ মানেই অসম্প্রদায়িক এবং উঁচু-নিচু, ছোটো-বড়ো ভেদাভেদহীন বাঙালির বাঁধভাঙা আনন্দের জোয়ার, উল্লাস-আড্ডায় ভরপুর উদ্বেলিত প্রাণে সুখের বার্তা। বৈশাখ মানে আনন্দে উদ্বেলিত বাঙালির বুকভরা আশা আর রঙিন স্বপ্ন বাঙালির হালখাতা, পুণ্যাহ আর মেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকা বাংলার বাতাসে বাতাসা, জিলাপি, মুড়ি-মুড়কি, খই, গজার গন্ধে মুখরিত থাকা চারদিক তালপাতার বাঁশি আর পালা গান, জারি গান, গাজির গান, বাউল গান, মারফতি, মুর্শিদি, ভাটিয়ালি গানের সুর ভাসা হাটে-মাঠে-ঘাটে লালপেড়ে শাড়ি আর লালসাদা পাঞ্জাবির কড়কড়ে সুবাস ও রেশমি চুড়ির স্পন্দিত কলরোল, কৃষ্ণচূড়ার লাল আর পাখির ডাকে হাস্যে-আনন্দে থাকা ঢোল, ডুগডুগির আওয়াজে রঙিন আনন্দঘন উৎসব। বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী বৈশাখ উদ্‌যাপনে পছন্দের পোশাক, সাজ-সজ্জাসহ বাঙালি সংস্কৃতির ধারক-বাহক হিসেবে পরিচিত নানা পণ্য কিনে থাকে। বৈশাখের প্রথম দিন নানা আয়োজনে খাবার রান্নার প্রস্তুতি চলে। ফেরিওয়ালার ঝুড়ি থেকে ফুটপাথ, শপিংমল সব জায়গায় থাকে বৈশাখি বেচাকেনার ধুম। চিরচেনা এই রূপ এবার নেই। ১৪২৭-এর আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্নার হিসাব চুকিয়ে শুরু হবে নতুন এক পথচলা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সর্বজনীন উৎসবে ঘরোয়া পরিবেশে মেতে ওঠা বাঙালি গাইবে– 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো'।

সব জায়গায় দোলা দেবে পহেলা বৈশাখ তবে সেটা অন্যভাবে। বৈশ্বিক দুর্যোগ করোনার কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার সরকারি নির্দেশনার কারণে এবারের বৈশাখে থাকছে না শারীরিক উপস্থিতির কোনো আনুষ্ঠানিকতা। রমনার বটমূলে থাকবে না ছায়ানটের বর্ষবরণ, চারুকলায় থাকবে না মঙ্গল শোভাযাত্রা। স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কারণে জনস্বাস্থ্য ও জনস্বার্থের কথা চিন্তা করে রমনার বটমূল, টিএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ, শিল্পকলা একাডেমি, হাতিরঝিল, বাংলা একাডেমিসহ উৎসবের রঙিন আঙ্গিনাগুলো ঢাকা থাকবে স্বাস্থ্যবিধির চাদরে।

আর উদীচী, খেলাঘর, গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন, ছায়ানটসহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলোও গতবারের মতো অনলাইনে নববর্ষের আয়োজন করছে। সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেলগুলো প্রচার করবে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা। সংবাদপত্রগুলো প্রকাশ করবে ক্রোড়পত্র ও বিশেষ নিবন্ধ। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে সব কারাগার, হাসপাতাল ও শিশু পরিবারে (এতিমখানা) উন্নতমানের ঐতিহ্যবাহী বাঙালি খাবারের ব্যবস্থা করা হবে।

পহেলা বৈশাখ একান্তই বাঙালির উৎসব। পহেলা বৈশাখ বাঙালির সবচেয়ে বড়ো অসাম্প্রদায়িক উৎসব। করোনাকালীন এ নববর্ষে আমাদের প্রত্যাশা, করোনা প্রতিরোধ করতে মানুষ ঘর থেকে বের না হলেও নতুন বছরের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো সব জরা-গ্লানি মুছে ফেলে সবাই আবার গেয়ে উঠবে নতুন ঝলমলে দিনের গান। আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্নার হিসাব শেষে শুরু হবে অবিরাম পথচলা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সবাই স্ব স্ব অবস্থান থেকে শপথ নেবে। আর এ শপথ হবে করোনা প্রতিরোধের। করোনাবিরোধী যে লড়াই প্রশাসন, চিকিৎসক, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী চালিয়ে যাচ্ছে, নতুন বছরে সে ক্ষেত্রে আমরা বিজয় দেখব। দেশের জনসাধারণ যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করে যাচ্ছে, নতুন বছরে তার স্বস্তিদায়ক অবসান হবে। সব রোগ-শোক-জরা-গ্লানি ঝেড়ে ফেলে নতুন বছর দেশবাসীর জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধির বার্তা বয়ে আনবে– এটাই প্রত্যাশা। শুভ হোক ১৪২৮। আগামী দিনগুলোতেও আমরা একত্র হয়ে গাইব বাঙালিত্ব তথা মানবতার জয়গান।

লেখক: সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক

ইমপোরিয়া ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে প্রযুক্তিকে শক্তিশালী হাতিয়ার ব্যবহার করতে হবে। তিনি বলেন, বিশেষভাবে অক্ষম বা যে-কোনো ধরনের প্রতিবন্ধীসহ দেশের প্রতিটি নাগরিকের সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে বর্তমান সরকার।

প্রতিমন্ত্রী ২৮শে মার্চ আইসিটি বিভাগের 'তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ (এনডিডি) সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন' প্রকল্পের অধীনে দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী সফটওয়্যার 'ইমপোরিয়া'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধীদের জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'ইমপোরিয়া' তৈরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, আইসিটি বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত জবফেয়ারে প্রতিবন্ধী, শিক্ষিত সকলে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ইন্টারভিউ দিতে ঢাকা আসেন। তাদের সময়, খরচ ও হয়রানি কমাতে এ প্ল্যাটফর্মটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বিশেষভাবে সক্ষম প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সম্ভাব্য চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে 'ইমপোরিয়া' প্ল্যাটফর্মটি কাজ করবে উল্লেখ করে বলেন, এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধীগণ আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ, চাকরি প্রত্যাশীগণ জীবন বৃত্তান্ত জমা রাখা এবং চাকরির ইন্টারভিউ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারবে। তিনি বলেন, প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজন অনুযায়ী সক্ষম করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন আইটি প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে আইসিটি বিভাগ। প্রতিবন্ধীদের সুযোগের সমতা, অধিকার নিশ্চিত করতে সকল সক্ষম ব্যক্তিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। প্রখ্যাত অটিজম বিশেষজ্ঞ সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের অনুপ্রেরণায় 'ইমপোরিয়া' সফটওয়্যারটি তৈরি করা হয়। 'ইমপোরিয়া' সফটওয়্যারে প্রবেশের লিংক: http://emporia.bcc.gov.bd/1।

প্রতিবেদন : জে আর পঙ্কজ

বঙ্গবন্ধু ও ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা

ইমরান পরশ

বঙ্গবন্ধু আমাদের অস্তিত্বে। বাংলাদেশের শিরায় শিরায় তিনি বহমান। বাঙালি জাতির পিতা। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গবন্ধুর অপর নাম বাংলাদেশ। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন তাঁর নাম চিরভাস্বর হয়ে থাকবে বাংলাদেশ আর বাঙালির হৃদয়ে। সাধারণ মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধু হিমালয়তুল্য। প্রিয় নেতা। প্রিয় মুজিব ভাই। অনেকের কাছে শেখ সাহেব। সেই শেখ সাহেব বা মুজিব ভাই বাঙালিকে দিয়েছেন তাদের বেঁচে থাকার জন্য নিরাপদ একটি রাষ্ট্র। যেখানে শোষণ থাকবে না। নিপীড়ন থাকবে না। সকল ধর্মের মানুষ নিরাপদে বাস করবে। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। ধর্মের নামে সহিংসতা করবে না। বাংলাদেশ হবে বিশ্বের অন্যতম শান্তিপ্রিয় একটি দেশ। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত। সেই ভঙ্গুর রাষ্ট্রকে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

বাংলাদেশের প্রায় আশি ভাগ মানুষ ইসলাম ধর্মের অনুসারী। বঙ্গবন্ধু নিজেও ইসলাম ধর্মানুসারী ছিলেন। সব ধর্মের প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। তিনি রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করেননি। ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন তিনি। সংখ্যাগুরু মুসলিমদের কথা চিন্তা করে তিনি ইসলামের সম্প্রসারণ, ইসলামি মূল্যবোধ প্রচার-প্রসারে সীমাহীন অবদান রেখে গেছেন, তাঁর সে সকল কাজ সমকালীন মুসলিম দুনিয়ার ইতিহাসে অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে চিরকাল। বঙ্গবন্ধু ইসলাম শিক্ষা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান ও মুসলমান সম্পর্কীয় বিষয়গুলোর ওপরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব ও মনোযোগ দিয়েছিলেন। এরমধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন, বেতার ও টিভিতে কোরান তিলাওয়াত ও তরজমা পেশের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, কাকরাইল মসজিদের জন্য অতিরিক্ত জায়গা বরাদ্দ, টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমার জন্য স্থান নির্ধারণ, বাংলাদেশে ঈদে মিলাদুন্নবি (সা.) উদ্‌যাপন এবং মদ, জুয়া ও লটারি নিষিদ্ধ করা ছিল তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ।

বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন এখন সরকারি অর্থে পরিচালিত মুসলিম বিশ্বের অন্যতম একটি বৃহৎ সংস্থা হিসেবে নন্দিত। এ প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রীয়ভাবে ১৭টি বিভাগ, ৭টি প্রকল্প, ১টি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, মাঠপর্যায়ে ৮টি বিভাগীয়সহ ৬৪টি জেলা কার্যালয় এবং আর্তমানবতার সেবায় ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির মাধ্যমে সারা দেশে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২শে মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ২৮শে মার্চ ১৯৭৫ সালে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' অ্যাক্ট প্রণীত হয়। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। অনেককাল আগে থেকে এদেশে ইসলামি আদর্শ ও মূল্যবোধের লালন ও চর্চা হয়ে আসছে। ইসলামের এই সমুন্নত আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন জাতির পিতা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম নিম্নরূপ

(ক) মসজিদ ও ইসলামি কেন্দ্র, একাডেমি ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(খ) মসজিদ ও ইসলামি কেন্দ্র, একাডেমি ও ইনস্টিটিউট এবং সমাজসেবায় নিবেদিত সংগঠনসমূহকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া;

(গ) সংস্কৃতি, চিন্তা, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের ওপর গবেষণা পরিচালনা;

(ঘ) ইসলামের মৌলিক আদর্শ বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি প্রচার করা ও প্রচারের কাজে সহায়তা করা এবং সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামি মূল্যবোধ ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের সুপারিশ করা;

(ঙ) ইসলামি মূল্যবোধ ও নীতিমালা জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণার আয়োজন করা ও তার প্রসার ঘটানো এবং জনপ্রিয় ইসলামি সাহিত্য সুলভে প্রকাশ করা এবং সেগুলোর বিলি-বণ্টনকে উৎসাহিত করা;

(চ) ইসলাম ও ইসলামের বিষয় সম্পর্কিত বই-পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচার পুস্তিকা অনুবাদ করা, সংকলন করা ও প্রকাশ করা;

(ছ) ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদির ওপর সম্মেলন, বক্তৃতামালা, বিতর্ক ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা।

(জ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন করা;

(ঝ) ইসলাম সম্পর্কিত প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া, প্রকল্প গ্রহণ করা কিংবা তাতে সহায়তা করা;

(ঞ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করা;

(ট) বায়তুল মোকাররম মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নতি বিধান করা এবং

(ঠ) উপরিউক্ত কার্যাবলির যে-কোনোটির ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক সকল কাজ সম্পাদন করা।

মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের অবমূল্যায়ন নিরসনকল্পে এবং সম্মান বৃদ্ধি করতেই বঙ্গবন্ধু ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্তমানে ৬৪টি জেলায় এর শাখা রয়েছে। উপজেলাভিত্তিক পর্যায়েও এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ১৯৯৮ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বঙ্গবন্ধু এ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে এ পর্যন্ত এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত রয়েছে; বিশেষ করে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম। লাখ লাখ শিশু নিরক্ষরতার হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু ইসলামি শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং এর সফল প্রচার-প্রসারের জন্য মাদ্রাসা বোর্ড পুনর্গঠন করেছিলেন। তিনি দেশের দায়িত্বভার গ্রহণের পরই তাঁর কাছে অভিযোগ এসেছিল, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসাসহ আলেম-উলামারা মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে। সে কারণে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু এ কথা শুনে ঢাকা আলিয়ার ছাত্রাবাস আল্লামা কাশগরি হল মসজিদে এসে শিক্ষকদের নিয়ে বসে বিস্তারিত শুনলেন এবং জানলেন। জানার পর দেখলেন, কিছুসংখ্যক চিহ্নিত সুবিধাভোগী লোক ছাড়া ঢাকা আলিয়াসহ সারা দেশের উল্লেখযোগ্য হকপন্থি কোনো আলেম স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেননি। এরপর তাৎক্ষণিকভাবেই তিনি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েই মাদ্রাসা বোর্ডের অনুমতি দিয়েছিলেন। বর্তমানে এমপিওভুক্ত এসব আলিয়া মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার। বর্তমান আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সমন্বয়ের মাধ্যমে আধুনিকায়ন করা সম্ভব হয়েছে। মাদ্রাসাগুলো সরকারি দান-অনুদান, মাদ্রাসা বোর্ড ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠদান করছে। বলতে হয়, আজ মাদ্রাসা শিক্ষায় এ আলিয়া ধারার সংখ্যাধিক্য, ব্যাপক বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণ কাজ বঙ্গবন্ধুর উন্নত ধর্মীয় মানসিকতার কারণেই সম্ভব হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু বাঙালি মুসলমানদের সমাজজীবনে ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় যেসব অবদান রেখেছেন, পাকিস্তান সরকারের ২৪ বছরে এর একভাগও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাবলিগ জামাতের কেন্দ্র কাকরাইল মসজিদের সম্প্রসারণের জন্য রমনা পার্কের কিছু জায়গার প্রয়োজন পড়ে। তখন বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে পার্কের অনেকখানি জায়গা কাকরাইল মসজিদকে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমার জন্য সরকারি জমি প্রদান করেন এবং ইজতেমার পরিধি আরো বড় করেছিলেন। ১৯৯৬ সালেও আওয়ামী লীগ সরকার এ জায়গায় ১৬০ একর জমি স্থায়ীভাবে ইজতেমার জন্য বরাদ্দ দেয় এবং সেখানে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়। বাংলা ভূখণ্ডের ইতিহাসে একজন রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবি (সা.) অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন প্রথম বঙ্গবন্ধুই করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে সর্বপ্রথম দেশের সত্যপন্থি আলেম সমাজ কর্তৃক 'সিরাত মজলিশ' গঠন করে প্রথম পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবি (সা.) মাহফিল উদ্‌যাপনের এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে মদ, জুয়া, লটারি– এসব ইসলামবিরোধী কাজ আইনগতভাবে বৈধ ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের সরকার দেশ পরিচালনার সময় আইন পাস করে মদ, জুয়া, লটারি প্রভৃতি ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন। ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় দিবস শবেবরাত, শবেকদর ও ঈদে মিলাদুন্নবি (সা.) উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণাও বঙ্গবন্ধু সরকারই করেছিল।

বঙ্গবন্ধু জানতেন, মুসলিম দুনিয়ার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় ইসলামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এজন্য তিনি ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে সরকারি বিবৃতির মাধ্যমে ইসরাইলের বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপনের পর আরবদের শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ ২৮ সদস্যের একটি চিকিৎসক দল প্রেরণ করেন। পাঁচ হাজার সদস্যের স্বেচ্ছাসেবী মুক্তিযোদ্ধা প্রেরণ করেন, মিসরের জন্য এক লাখ পাউন্ড চা পাঠান। আরবদের এসব সহযোগিতা প্রদান করে বঙ্গবন্ধু খাঁটি মুসলমানের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাতে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক সাফল্য বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে, সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়েছে। তিনি ছিলেন খুবই উদার, মহৎ, আন্তর্জাতিক দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক। ইসলামের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে গোটা দুনিয়া, বিশেষ করে মুসলিম দুনিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে মূলত বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা, মেধা এবং সীমাহীন কর্মপ্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে। একজন ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু। নিজে ধর্ম পালন করতেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মীয়ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখার জন্য কাজ করেছেন। আবার ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবেও বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ইসলামের খেদমতে কাজ করে যাচ্ছেন। ধর্মান্ধদের অপপ্রচার মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে নিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক। জয় বাংলা।

লেখক : সাংবাদিক, শিশুসাহিত্যিক ও কলামিস্ট

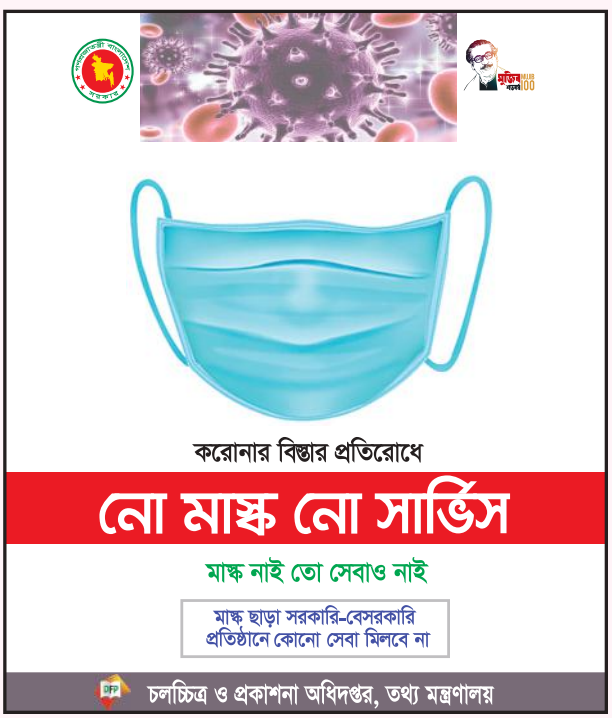

বৈশাখি মেলা অসাম্প্রদায়িকতার প্রেরণা

মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

আইল, আইল আইল রে
রঙে ভরা বৈশাখ আবার আইল রে।

এই গানটির দুই স্তবক শুনলেই বাঙালির মন আনচান করে উঠে। আপন মনে ভাবতে থাকে কবে বৈশাখ আসছে। পুরোনো বছরের জরাজীর্ণতা ফেলে নতুন করে বৈশাখ তথা নববর্ষকে আপ্যায়ন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বাঙালি। বাঙালি সমাজে পহেলা বৈশাখ নববর্ষকে নতুন করে বরণ করার রীতি অনেক আগে থেকেই চলে আসছে। আগে শুধু গ্রাম্য সমাজেই নববর্ষ তথা বৈশাখি উৎসব ঘটা করে পালিত হতো। কিন্তু এখন বৈশাখি উৎসব গ্রামগঞ্জ ছাড়িয়ে শহরের আয়োজন আপ্যায়ন বেশি মাত্রায় দেখা যায়। এই বৈশাখি উৎসবের মেলায় বাঙালির উদ্ভাস-উচ্ছ্বাসকে এক ধরনের জাগরণও বলা যায়। এটা কোনো ধর্মীয় উৎসব নয়। দল-মত নির্বিশেষে সকল বাঙালিই এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে বৈশাখি মেলাকে উপভোগ করে। তাই এই উৎসবের মেলাকে বাঙালির অসাম্প্রদায়িকতার চেতনা হিসেবে বিবেচিত করা যায়।

বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ আমাদের বাঙালির জাতীয় উৎসব। আমাদের দেশে আরো উৎসব আছে। কিছু ধর্মীয় উৎসব, কিছু ঋতু উৎসব। আবার বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এগুলো জাতীয় উৎসবও বটে। তবে বাংলা নববর্ষ উৎসব বাংলাদেশের তথা বাঙালির সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের এক মহা উৎসব।

বাংলা নববর্ষ উৎসব সর্বপ্রথম কখন, কীভাবে শুরু হয়েছে তার সঠিক ইতিহাস বলা কঠিন। তবে কারো মতানুসারে, মোগল সম্রাট আকবর প্রথম বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। সম্রাট আকবরের নির্দেশে বাংলার বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ ফতেহউল্লাহ সিরাজী বাংলা সনের নিয়ম বিনির্মাণ করেন। এই সন বাংলা বর্ষ হিসেবে পরিচিত হয়। তখন থেকে মোগল সম্রাটগণ ইরানের নববর্ষ উৎসব 'নওরোজ'কে অনুসরণ করে দিল্লিতে নববর্ষ উৎসব ও মীনা বাজার (মেয়েদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাওয়া যায়) চালু করেন। তবে এই উৎসব রাজপরিবারদের ও অভিজাত ধনী-বণিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, সেখান থেকে বাংলা নববর্ষ স্থান পেয়েছে।

আবার প্রাচীনকালে বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে 'আমানি' নামে একটি পারিবারিক উৎসব চালু ছিল। প্রতিবছর পহেলা বৈশাখের আগের দিন অর্থাৎ পুরনো বছরের দিবাগত রাতে একটি পাত্রে কিছু আতপ চাল পানিতে ভিজিয়ে রাখা হতো এবং একটি কচি আমপাতার ডালও রেখে দিতেন সেই পাত্রে বাড়ির গৃহিণী। নববর্ষ অর্থাৎ পহেলা বৈশাখের ভোরে সেই আমপাতার ডালটি পাত্রের পানিতে ডুবিয়ে সেই পানি বাড়ির সকলের শরীরে ছিটিয়ে দেওয়া হতো। আর পাত্রের ভেজানো চাল বাড়ির সবাইকে খেতে দেওয়া হতো। তাদের বিশ্বাস ছিল–এতে সারা বছর সকলের মঙ্গল হবে, কোনো রোগবালাই হবে না, বিপদ-আপদ হবে না। বাড়ির মালিক ভেজা চাল খেয়ে ক্ষেতে হালচাষ করতে যেতেন। ধারণা করা হতো, এতে ক্ষেতের ফসলের বৃদ্ধি হবে, কোনো অমঙ্গলে ফসল নাশ হবে না। বাংলা নববর্ষ উৎসবের এটিও একটি প্রাচীন অংশ হয়ে আছে।

নববর্ষের সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার ছিল মেলা। প্রাচীন বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় চৈত্র সংক্রান্তির দিনে এবং পহেলা বৈশাখের সকালে মেলা বসত। এই মেলাটি ছিল খুবই প্রয়োজনীয়। কারণ বাংলার কৃষিনির্ভর মানুষের হাতে কাঁচাপয়সা সবসময় থাকত না। আবার এখনকার মতো আশপাশে এত দোকানপাটও ছিল না। প্রয়োজনীয় জিনিসটি ইচ্ছে হলেই সাথে সাথে কিনে ব্যবহার করতে পারত না। তাই প্রতিবছরের এই বৈশাখি মেলা থেকেই গ্রামের মানুষ হাঁড়ি-পাতিল, দা-কাঁচি, কোদাল-কুড়াল থেকে শুরু করে সংসারের সারা বছরের যাবতীয় তৈজসপত্র কিনে রাখত। ছোটোদের খেলনা হাঁড়ি-পাতিল, মাটির পুতুল-ঘোড়া-হাতি-বাঘ, লাটিম, চড়কা থেকে শুরু করে মেয়েদের চুড়ি, আলতা, ফিতাসহ সব ধরনের জিনিসই এই মেলা থেকে গ্রামের মানুষরা কিনে নিত নিজ পরিবারের ছেলেমেয়েদের ও ছোটোদের জন্য।

নববর্ষের প্রাচীন দিক ছাড়িয়ে আরো এগুলো দেখা যায়, ইংরেজ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে জমিদারি প্রথা চালু করা হয়। জমিদাররা খাজনা আদায়ের জন্য বছরের প্রথম দিনে তাদের বাড়িতে একটি উৎসব করতেন। সেই উৎসবে কৃষক ও প্রজারা জমিদারির খাজনা পরিশোধ করত বিনিময়ে মিষ্টিমুখে আপ্যায়িত হয়ে বাড়ি যেত। এই উৎসবকে বলা হতো 'পুণ্যাহ'।

এরপর থেকে দেশে ব্যাবসা-বাণিজ্য প্রথা কিছুটা গড়ে উঠতে শুরু করেছে। তাই দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিস দোকানিরা বিক্রিও শুরু করেন। কিন্তু তখনকার সাধারণ মানুষের হাতে নগদ পয়সা ছিল না। তাই তারা বাকিতে দোকান থেকে সওদা কিনত। ব্যবসায়ীরা বছরের প্রথম নতুন হালখাতা তৈরি করতেন। গত বছরে কে কত টাকার সদাই বাকি নিয়েছে তা পুরোনো হালখাতা দেখে ক্রেতারা দেনা পরিশোধ করতেন এবং দোকানিরা ক্রেতাদের মিষ্টিমুখ করাতেন। দোকানিরা তাদের দোকান সাজাতেন নানা রঙের রঙিন কাগজের মালা ও মোড়ক দিয়ে। তারা দোকানে আগরবাতি, ধূপধুনো জ্বালাতেন, গোলাপজল ছিটাতেন। নিজ দোকানটাকে তারা একেবারে ছিমছাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে একটি নতুন দোকান বানিয়ে ফেলতেন। ক্রেতা

ও বিক্রেতার মিলন ঘটত একটি আনন্দপূর্ণ পরিবেশে। দোকানির হালখাতার এই নিয়ম-নীতি পূর্বকাল থেকে এখনো দেখা যায় একই কায়দায় আছে। নববর্ষ পালনের প্রাচীন কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো।

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদের পরিবারের উদ্যোগে নববর্ষ উদ্‌যাপন করা হতো। সেই থেকে শহরের শিক্ষিত লোকজনও পশ্চিম বাংলার নানা শহরে নববর্ষ পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করতে শুরু করে।

বাঙালি জীবনের সঙ্গে মেলার যোগসূত্র দীর্ঘকালের। এই সম্পর্ক নিবিড় ও আত্মিক। লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির সমন্বিত অন্তরঙ্গ পরিচয় মেলাতেই সার্থকভাবে প্রকাশ পায়। তাছাড়া বৈশাখি মেলার একটা নিজস্ব সর্বজনীন রূপ আছে। মেলায় অংশগ্রহণ কোনো সম্প্রদায় বা ধর্মের ভিন্নতা বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। কেননা মেলার আর্থ-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সবকিছু ছাড়িয়ে। তাই মেলায় সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের আনাগোনা থাকে। মৈত্রী-সম্প্রীতির এক উদার মিলনক্ষেত্র এই মেলা। নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর সবাই মেলায় আসে। তাদের অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা একটি তাহলো মেলা দেখা। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বেচাকেনার আশা আর বিনোদনের টান। গ্রাম্য নারী ও বধূদের নেশা থাকে আলতা-সিঁদুর-স্নো-পাউডার ও নানা ধরনের চুড়ি, গলার মালা, নুপুর এসবের প্রতি। এছাড়া ঘর-গৃহস্থালির টুকিটাকি জিনিসও গ্রাম্য কৃষকরা কিনে। শিশুদের খেয়াল থাকে খেলনার দিকেই। মাটির পুতুল, কাঠের ঘোড়া, টিনের জাহাজ, খেলনা বল, কাগজের চড়কা, মুখোশ আরও কত কি। খাবারের মধ্যে খই-বাতাসা, কদমা, জিলিপি, গজা, রসমঞ্জুরি, নিমকি– এসব খাবারেও সবার নেশা থাকে। আরো থাকে তালপাতার বাঁশি। বিনোদনের মধ্যে থাকে দর্শকদের মনোরঞ্জনের নাগরদোলা, ম্যাজিক, লাঠি খেলা, কুস্তি, পুতুলনাচ, যাত্রা, সার্কাস, কবিগান, বাউল-ফকিরি গান, জারি গান, বায়োস্কোপ তো থাকেই, কখনো কখনো সঙের কৌতুক-মশকরা সারা মেলাকে মাতিয়ে রাখে।

পূর্ব পাকিস্তান শাসনামলে নববর্ষ পালন প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে ওঠে। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সত্যের আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায় বাংলা নববর্ষ। পাকিস্তান শাসকশ্রেণি যখন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি থেকে অসাম্প্রদায়িক ধারা ও রবীন্দ্র সাহিত্য নিষিদ্ধ করে তখন নব চেতনায় সারা বাংলাদেশে 'বাংলা নববর্ষ' পালনের উদ্যোগ নেয়। ১৯৬১ সালে ছায়ানট প্রতিষ্ঠিত হয়। আর পরবর্তী সময় সংগঠনটি রমনা বটমূলে বাংলা নববর্ষের সূর্যোদয়ের সঙ্গে দিবসটি পালনের নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৯৬৪ সালের বাংলা ১৩৭১-এর পহেলা বৈশাখ ঢাকায় রমনার বটমূলে ছায়ানট প্রথম নববর্ষ পালন করে। এরপর ১৯৬৭ সাল থেকে ছায়ানটের সভাপতি সনজীদা খাতুনের সভাপতিত্বে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং সবার মাঝে ঘটা করে অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়।

নববর্ষ তথা পহেলা বৈশাখে আমাদের বাঙালির খাওয়ার কিছু রীতি আছে। যেমন-পান্তা ইলিশ খাওয়া। পান্তাভাত আমাদের গ্রামীণ জীবনের সাধারণ মানুষের খাবার। যারা গরম ভাত খাওয়ার তরকারি জোগার করতে অক্ষম, যারা গরম ভাতের আয়োজনে সময় ও ঝুঁকি এড়াতে চায় তারা এবং অনেকে গরমের ভেতর পেট ঠান্ডা রাখার জন্যও পান্তা খায়। এবার ইলিশের কথা বলি। ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। তাই এটা বছরের প্রথম দিন সবাই খেতে চায়। এছাড়া শুটকি ভর্তা, আলু ভর্তা, সব্‌জি ভর্তা দিয়ে অনেকে পান্তা খায়। এটা নিজ দেশের গ্রামীণ সমাজের একটি নিত্য দিনের খাবার। তাই বছরের প্রথম দিন সবাই এ ধরনের খাবার খায়।

আবহমানকাল থেকে বাঙালির চিরন্তন সর্বজনীন অনুষ্ঠান বাংলা নববর্ষ। বাঙালি আর বাংলা নববর্ষ এক বিকল্পহীন অভিযাত্রা। এই সময়ে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই আনন্দে উদ্বেল হয় নতুন বর্ষের আহ্বানে। মঙ্গল শোভাযাত্রা, হালখাতা, লোকসংস্কৃতির মেলা, মেয়েদের লাল পেড়ে সাদা সুতি শাড়ি ও ছেলেদের পায়জামা-পাঞ্জাবি পড়ে অর্থাৎ বাঙালিয়ানা পোশাক পড়ে নববর্ষের সূর্যোদয় উদ্‌যাপন করে প্রতিটি মুহূর্ত। আগে থেকেই নববর্ষে নতুন শাড়ি পরার প্রচলন ছিল। পহেলা বৈশাখের শোভাযাত্রা থেকে শুরু করে বৈশাখি মেলা সবই ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সর্বজনীন একটি উৎসব। এই দিনে সবাই প্রাণের উচ্ছ্বাসে ভেসে যেতে যেতে অনুভব করে বাঙালিত্বের অনাবিল বিচিত্র স্বাদ। বৈশাখ মানে ষোলোআনা বাঙালিয়ানা।

বাংলা নববর্ষের মঙ্গল শোভাযাত্রা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্থান পেয়েছে। জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউনেস্কো বাংলাদেশ সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের আবেদনক্রমে ২০১৬ সালের ৩০শে নভেম্বর বাংলাদেশের মঙ্গল শোভাযাত্রাকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। ২০১৬ সালের ২৮শে নভেম্বর থেকে ২রা ডিসেম্বর ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক পর্ষদ মঙ্গল শোভাযাত্রার বিষয়টি অনুমোদন করে। স্বাধীন বাংলাদেশে অশুভ শক্তিকে নাশ করে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে ১৯৯০ সাল থেকে এই মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হয়।

বৈশাখের সঙ্গে অর্থনীতির একটি নিবিড় যোগসূত্র আছে। বিশেষভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে তার প্রমাণ দেখি বৈশাখি মেলায় ও শহরের অর্থনীতিতে হালখাতায়। বৈশাখের এই অর্থনীতির বিকাশ ঘটছে জাতীয় আর্থিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে মিল রেখে। সরকার বৈশাখি উৎসব ভাতা প্রবর্তন করে এর অর্থনীতি আরো সচল করতে ভূমিকা পালন করছে।

বৈশাখি উৎসব বাঙালি জাতিকে যে গৌরবের প্রান্তরে দাঁড় করায় তা সার্থক করে তুলতে হলে এর অন্তরের দিকে আমাদের আরও গভীরভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। বৈশাখ হচ্ছে সর্বজনীন, সব ধর্ম ও মতের বাঙালির এক হওয়ার পণ ও পন্থা। বাঙালি স্বভাবগতভাবে মিলনে-মিশ্রণে গড়ে ওঠা অসাম্প্রদায়িক মানবসত্তা তথা জাতিসত্তা। এই সম্প্রীতি চেতনা ও সর্ব ধর্মের সমন্বয়ী ধারা বৈশাখের মর্মবাণী, আজকের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যা হয়ে ওঠেছে আরো গুরুত্বপূর্ণ। বৈশাখি উৎসবের বাস্তবায়নে কতভাবে কতরূপে ভূমিকা পালন করতে পারে সেটাই বড়ো বিবেচ্য। আর সেজন্য প্রয়োজন বৈশাখি উৎসবের প্রতি আরও নিবিষ্ট মনোযোগ ও গভীর বিবেচনা প্রদান।

বিশেষ করে পহেলা বৈশাখ তথা নববর্ষের মঙ্গল শোভাযাত্রা ও বৈশাখি মেলাতে বাঙালির এত আগমন দেখা যায় যে এতে বোঝা যায় কোনো ধর্ম বা বর্ণ নয় সব বাঙালিই এতে অংশগ্রহণ করছে। তাই সবশেষে বলা যায়, বৈশাখি উৎসবের মেলা বাঙালি জাতির অসাম্প্রদায়িকতার একটি বড়ো প্রেরণা।

লেখক : মুন্সিগঞ্জ সংবাদদাতা (বাংলাদেশ বেতার), গল্পকার ও প্রাবন্ধিক

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

পাবলিক প্লেসে ধূমপান দণ্ডনীয় অপরাধ।

শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি

নূরজাহান বেগম

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান,
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান...

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার গর্বিত নাগরিক আমরা। ত্রিশ লাখ জীবনের বিনিময়ে প্রাপ্ত এ বাংলাদেশকে সোনালি ফসলে ভরপুর দেখতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সে কারণেই স্বাধীনতার পর তিনি ডাক দিয়েছিলেন সবুজ বিপ্লবের। তাঁর প্রণীত এ পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে সবুজায়িত হবে সারা বাংলা, সুখে থাকবে বাংলার মানুষ।

বঙ্গবন্ধুর আজীবনের লালিত স্বপ্ন ছিল এদেশের শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত কৃষকের মুখে হাসি ফোটানো। তাই তিনি সার্বিক কৃষি খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদানের পাশাপাশি কৃষি উন্নয়নের সৈনিক কৃষিবিদদের যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে তাঁর কৃষকসমাজ বগুড়ার শেরপুর উপজেলার বালেন্দা গ্রামে একশ বিঘা জমিতে দুই জাতের ধান লাগিয়ে তৈরি করেছে বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বড়ো প্রতিকৃতি। এটি কোনো রঙের ছোয়ায় নয়, শিল্পীর তুলিতে আঁকা হয়নি। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এ উদ্যোগ নিয়েছে শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পরিষদ। এই পুরো প্রকল্পের ভাবনা, নকশা এবং বাস্তবায়ন করেছে এক্সপ্রেসিভ কমিউনিকেশনস লিমিটেড। আর অর্থায়ন করেছে ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার গ্রুপ।

এদিকে চীনের রেকর্ড ভেঙে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এ স্থান পেয়েছে বগুড়ার শেরপুর উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়নের বালেন্দা গ্রামের মাঠে ধানক্ষেতে শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি। সবুজ ও বেগুনি ধানের চারা লাগিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে জাতির পিতার অবয়ব।

ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার সিডস প্রকল্পে শেরপুরের এই মাঠে ১২০ একর জমি ইজারা নেওয়া আছে। এই জমি থেকে শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি আঁকার জন্য ১০০ বিঘা জমি আলাদা করা হয়। এরপর ২৯শে জানুয়ারি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি তৈরির কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন। কারিগরি দিক বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে শত বিঘায় ক্রপ ফিল্ড মোজাইক বা শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। কৃষিমন্ত্রীর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রস্তাবনা তুলে ধরার পর আগ্রহ প্রকাশ করা হয়। পরে প্রকল্প বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিমের নেতৃত্বে 'শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পরিষদ' নামে ৫১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।

আয়োজকরা জানান, গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের তথ্যানুযায়ী সর্ববৃহৎ শস্যচিত্র ২০১৯ সালে চীনে তৈরি করা হয়। এর আয়তন ছিল ৮ লাখ ৫৫ হাজার ৭৮৬ বর্গফুট। বাংলাদেশের শস্যচিত্রের আয়তন প্রায় ১২ লাখ ৯২ হাজার বর্গফুট বা এক লাখ ২০ হাজার বর্গমিটার। শস্যচিত্রটির দৈর্ঘ্য ৪০০ মিটার ও প্রস্থ ৩০০ মিটার। এটিই একক ব্যক্তি হিসেবে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো প্রতিকৃতি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

বঙ্গবন্ধুর হাতেই আজকের চলচ্চিত্রের গোড়াপত্তন

শিহাব শুভ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মুক্তির আরেক নাম। পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন তিনি। বঙ্গবন্ধু তাঁর অসীম সাহসিকতায় দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীন করেছেন। চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা স্বপ্ন দেখতেন বঙ্গবন্ধু আগের মতোই এ শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে যাবেন এবং পরবর্তী সময়ে তাদের সে স্বপ্ন সত্যি হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর হাতেই চলচ্চিত্র শিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু চলচ্চিত্র শিল্পকে এগিয়ে নিতে বেশ কিছু মাইলফলক উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যা আজ পর্যন্ত চলচ্চিত্রের পথচলায় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। ১৯৫৭ সালে এফডিসি

প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান অনস্বীকার্য।

প্রতিবছর প্রতি মাসের নির্দিষ্ট কিছু দিনে বিভিন্ন দেশে কিছু দিবস পালিত হয়। কোনো নির্দিষ্ট দিনে অতীতের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে স্মরণ করা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি করতে এই সমস্ত দিবস পালিত হয়। বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে পালিত সেই সমস্ত দিবসগুলোর মধ্যে একটি হলো জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস। ৩রা এপ্রিল সারা বাংলাদেশজুড়ে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প-বাণিজ্য, দুর্যোগ ও কল্যাণমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ২০১২ সাল থেকে এই দিনটিকে সরকারিভাবে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এবং ন্যাশনাল ফিল্ম অবজারভ্যান্স কমিটি এই দিবস উদ্‌যাপনের প্রধান আয়োজক।

বাংলাদেশে ১৮৯০-এর দশকে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী শুরু হয়েছিল। প্রথমে নির্বাক এবং পরে সবাক চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রদর্শন শুরু হয়। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের প্রথম নির্মাতা ও প্রদর্শক দুই সহোদর হীরালাল সেন ও মতিলাল সেন। রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানি গঠন করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, রাজশাহীসহ বিভিন্ন জেলায় চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। বঙ্গ সন্তান হীরালাল সেন ভারতীয় উপমহাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের জনক। ১৯৫৬ সালে ঢাকায় প্রথম সবাক চলচ্চিত্র *মুখ ও মুখোশ* মুক্তি পায়। তবে ১৯৩১ সালে মুক্তি পাওয়া *দ্য লাস্ট কিস* ছিল ঢাকার প্রথম ছবি। ছবিটি পরিচালনা করেন অম্বুজ গুপ্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে আর্মেনিয়ান স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠিত প্রথম সিনেমা হল হলো পিকচার হার্ডস। ১৯৫৬ সালে এই সিনেমা হলের মালিক মুস্তাফা এটির নাম বদলে রাখেন শাবিস্তান। ঢাকার প্রথম নিয়মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু হয় এই সিনেমা হলে। ঢাকার প্রথম সিনেমাস্কোপ ছবি *বাহানা*। ১৯৬৫ সালে এ ছবি মুক্তি পায় এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রঙিন ছবি *বাদশা* ১৯৭৫ সালে মুক্তি পায়। বঙ্গবন্ধুর আমলে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সংযোজন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই এ প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং ১৯৭২ সালে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাহিনিচিত্র নির্মাণ। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্যের প্রথম ছবি *ওরা ১১ জন* যেটি মুক্তি পায় ১৯৭২ সালে। ছবিটি পরিচালনা করেন চাষী নজরুল ইসলাম আর প্রযোজনা করেন মাসুদ পারভেজ। এছাড়াও পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের ওপর বহু সিনেমা তৈরি হয়েছিল। ১৯৭৬ সালে প্রথম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৬ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা ছবির পুরস্কার পায় *লাঠিয়াল*, সেরা পরিচালক হন নারায়ণ ঘোষ মিতা এবং সেরা অভিনেতা হন আনোয়ার হোসেন। জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শিত ছবি পরীক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড। প্রতিটি ফিল্মের সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পেতে হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে প্রতিষ্ঠিত এদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে নতুন প্রাণ সঞ্চার করছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর নেতৃত্বে আমরা ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে যেমন স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছে দেব, তেমনই বঙ্গবন্ধুর হাতে যাত্রা শুরু হওয়া আমাদের চলচ্চিত্র বাজারে একটি বিশেষ স্থান করে নেবে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

ধরিত্রী রক্ষায় প্রয়োজন সচেতনতা

শারমিন ইসলাম

'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি/ নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার'– সময়ের স্রোতে অনেক বছর পার হয়ে গেলেও কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের এ অঙ্গীকার আজও বিশ্বজনীন। ধরিত্র, ধরণী, বিশ্ব, দুনিয়া, পৃথিবী, ব্রহ্মাণ্ড– যে নামেই বলি না কেন ধীরে ধীরে তা হয়ে উঠছে বসবাসের অযোগ্য। পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছর ২২শে এপ্রিল পালিত হয় 'বিশ্ব ধরিত্রী দিবস'।

ষাটের দশকে পরিবেশ দূষণ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়নের ফলে মাটি, পানি, বায়ু সবকিছুই দূষিত হয়ে পড়ে। সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হচ্ছে তখন এই দূষণ প্রতিরোধের জন্য কোনো আইন পর্যন্ত ছিল না। ১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতে তেল উপচে পড়ে বিশাল দুর্যোগ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন সিনেটর গেলর্ড নেলসন সর্বপ্রথম ধরিত্রী দিবসের প্রচলন করেন। জলবায়ু সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তখন রাস্তায় নেমে এসেছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় দুই কোটি মানুষ। ১৯৯০ সালে ধরিত্রী দিবসের ২০ বছর পূর্তিতে আরেকটি বড়ো আন্দোলন দেখা যায়। বিশ্বজুড়ে প্রায় ২০ কোটি মানুষ একযোগে দিবসটি পালন করেন। বর্তমানে দিবসটি আর্থ ডে নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে ১৯৩টিরও বেশি দেশে পালিত হচ্ছে। পরিবেশ সুরক্ষায় ধরিত্রী দিবস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্যারিস চুক্তিতে ২০০টি দেশ বিশ্বব্যাপী গ্রিন হাউস নিষ্কাষণ কমাবার লক্ষ্যে ২০১৬ সালের ধরিত্রী দিবসে স্বাক্ষর করেছিল।

গত বছরের ন্যায় এ বছরও ধরিত্রী দিবস পালিত হচ্ছে করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যে। সমস্ত পৃথিবী এখন কোভিড-১৯-এর করাল গ্রাসে বিপর্যস্ত। করোনার কারণে অনেক দেশেই চলছে লকডাউন। চলছে না শিল্প-কারখানাসহ প্রায় সব ধরনের কলকারখানা এবং যানবাহন। ফলে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমেছে পরিবেশ দূষণ।

পৃথিবী যে অনিরাপদ এবং বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে তা স্পষ্টত লক্ষণীয়। এমন প্রেক্ষাপটে প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ধরিত্রী দিবস অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। ক্রমেই বেড়ে চলেছে মাটির ক্ষয়। এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ছে সাব সাহারন আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। ব্যাপক হারে বৃক্ষ নিধনের ফলে মাটির উপর চাপ তৈরি হচ্ছে। এর পাশাপাশি যোগ হয়েছে সারের ব্যাপক প্রয়োগ। ফলে খারাপ হচ্ছে মাটির স্বাস্থ্য। আবার তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন মৌসুমের ফলের পরিমাণও কমছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ২০৬০ সালের মধ্যে ভারতে চাল উৎপাদন ১২ শতাংশ কমতে চলেছে। গোটা এশিয়ায় পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, লাওস ও চীনের মতো দেশের। এশিয়ার ৪৮টি দেশের মধ্যে বর্তমানে ৩৮টি দেশে খরার প্রভাব রয়েছে। তার সাথে সিডর, আইলা, ক্যাটরিনা, বুলবুল প্রভৃতি ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প ধরিত্রীকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি করছে।

এ বছর ধরিত্রী দিবসের প্রতিপাদ্য– 'Restore Our Earth'। সবুজায়ন, প্রকৃতিবান্ধব প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং ব্যবহার আমাদের পৃথিবীকে করে তুলতে পারে আবার স্বাভাবিক, বাসযোগ্য। যদি আমরা পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য রাখতে চাই তাহলে লাগাতে হবে প্রচুর পরিমাণ গাছ। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির মুখে পৃথিবীর সব দেশ। তাই এ ব্যাপারে সকল দেশকেই নিতে হবে অগ্রণী ভূমিকা। আগামী প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত করতে বিশ্বের রাজনৈতিক নেতাদের অবশ্যই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় সক্ষম বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এটি গঠিত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৫ সালে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ পরিবেশ বিষয়ক পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ'-এ ভূষিত হন। নতুন প্রজন্মকে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কার্যকর পদক্ষেপ এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রচেষ্টা গ্রহণ বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং পরবর্তী ধাপের পাঠ্যপুস্তকে এ সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ধরিত্রী সুরক্ষায় আমাদের সকলকেই এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। তবেই আমরা নতুন প্রজন্মকে বাস উপযোগী নির্মল, সুন্দর পৃথিবী উপহার দিতে পারব।

লেখক: প্রাবন্ধিক

অটিজম সমস্যা সমাধানে সরকারের কার্যক্রম

শিরিনা আক্তার

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২রা এপ্রিল। অটিজম বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দিবসটি পালন করা হয়েছে। বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন। এবারের প্রতিপাদ্য– 'মহামারিত্তোর বিশ্বে ঝুঁকি প্রশমন, কর্মক্ষেত্রে সুযোগ হবে প্রসারণ।'

বাণীতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, '১৪তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি এবং তাদের পরিবার ও পরিচর্যাকারীদের শুভেচ্ছা জানাই।'

রাষ্ট্রপতি তাঁর বাণীতে বলেন, 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০২১ উপলক্ষে আমি দেশের সব অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি, তাদের পরিবার এবং অটিজম নিয়ে কর্মরত ব্যক্তি ও সংগঠনসমূহকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

অটিজমে আক্রান্ত শিশু ও বয়স্কদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০০৭ সালে ২রা এপ্রিলকে 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' হিসেবে পালনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর থেকে প্রতিবছর দিবসটি পালন করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা ও স্কুল সাইকোলজিস্ট সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের নিরলস প্রচেষ্টায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অটিজম বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি ২০০৭ সালে এ বিষয়ে দেশে কাজ শুরু করেন। সায়মা ওয়াজেদ এ অবহেলিত জনস্বাস্থ্য ইস্যুতে তার বিরাট অবদানের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্বীকৃতি পেয়েছেন।

অটিজম কোনো রোগ নয়, এটি হচ্ছে শিশুদের বিকাশগত একটি সমস্যা। স্নায়ু বিকাশের ভিন্নতাজনিত সীমাবদ্ধ পরিস্থিতিতে কিছু মানুষ যথাযথভাবে সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা, চলাফেরা, ভাববিনিময় এবং দৈনন্দিন কার্যনির্বাহে পরিপূর্ণ অংশগ্রহণে সমর্থ হয় না। স্নায়ু বিকাশের ভিন্নতার প্রধান ধরণগুলো হলো অটিজম, ডাউন সিনড্রোম, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা ও সেরিব্রাল পালসি। বাংলাদেশে বিপুলসংখ্যক শিশু অটিজম নামক নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত। অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুরা সাধারণত অন্যের সঙ্গে ঠিকমতো যোগাযোগ রক্ষা কিংবা মনোভাব প্রকাশ করতে পারে না। তারা যেমন অতিরিক্ত জেদি হয়ে থাকে, তেমনই নিজেদের গুটিয়ে রাখতে পছন্দ করে। গবেষকরা মনে করেন যে জেনেটিক-ননজেনেটিক এবং পরিবেশগত প্রভাবই অটিজমের জন্য দায়ী। তবে এমন শিশুদের নিয়মিত ও যথাযথ পরিচর্যাই হচ্ছে একমাত্র বিকল্প উপায়। এর ফলে তারা অনেকাংশেই স্বাভাবিকতায় ফিরতে পারে। পরিচর্যার সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে অটিস্টিক শিশুরাও সমাজের মূলধারায় ফিরে আসতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৭ লক্ষাধিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছে, যাদের মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার অটিজমসম্পন্ন ব্যক্তি।

সরকারের কার্যক্রমসমূহ

সরকার এরই মধ্যে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩-এর আওতায় নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট স্থাপন করেছে। এর মাধ্যমে পিতা-মাতা, পরিবার-পরিজন ও সমাজে অটিজম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অটিস্টিকদের চিকিৎসা এবং যথার্থ পরিচর্যার জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করা হয়েছে। অটিস্টিকসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক নিরাপত্তার ঝুঁকি বিবেচনায় ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মিরপুর ক্যাম্পাসে একটি 'অটিজম রিসোর্স সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে। অটিজমের শিকার শিশু ও ব্যক্তিদের ওই সেন্টার থেকে বিনামূল্যে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের থেরাপি সেবা, গ্রুপ থেরাপি, দৈনন্দিন কার্যবিধি প্রশিক্ষণসহ রেফারেল ও অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের পিতা-মাতাদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০১০ সালের ২রা এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে এটির উদ্‌বোধন হওয়ার পর থেকে জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৮৭৭ জন অটিজমের শিকার শিশু ও ব্যক্তিকে বিনামূল্যে ম্যানুয়াল ও Instrumental থেরাপি সেবা প্রদান করা হয়েছে।

২০১১ সালের অক্টোবর মাসে ওই ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম চালু করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ঢাকা শহরের মিরপুর, লালবাগ, উত্তরা ও যাত্রাবাড়ী, ৬ বিভাগীয় শহরে ৬টি এবং গাইবান্ধা জেলায় একটিসহ মোট ১১টি স্কুল চালু করা হয়েছে। এসব স্কুলে মোট ১৪৭ জন অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু বিনামূল্যে লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে। এ ধরনের স্কুল পর্যায়ক্রমে সব জেলা ও উপজেলায় সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। Early Detection, Assessment I Early Intervention নিশ্চিত করতে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় পরিচালিত ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে একটি করে 'অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে। ওই ১০৩টি কেন্দ্রে অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদের কাউন্সেলিংসহ বিভিন্ন ধরনের থেরাপিউটিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জুলাই ২০১৪ থেকে জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ২৬টি ব্যাচে বিভিন্ন জেলা-উপজেলাসহ তৃণমূল পর্যায়ে ৮২২ জন অটিজম ও এনডিডি সমস্যাগ্রস্ত সন্তানের অভিভাবক, পিতা-মাতা ও কেয়ারগিভারকে জীবনযাপন, আচরণগত সমস্যা, সাধারণ শিক্ষা ও সামাজিকতাসহ দৈনন্দিন কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের অটিজমসহ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে ৩২টি ভ্রাম্যমাণ থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে বিনামূল্যে বিভিন্ন থেরাপিউটিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো ডিসঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম (IPNA) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট; চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিক, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা শিশু হাসপাতাল; শিশু বিকাশ কেন্দ্র; সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, প্রয়াস বিশেষায়িত স্কুল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট; মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশুরোগ/মনোরোগবিদ্যা বিভাগ, কাছের জেলা সদর হাসপাতাল/উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও বিশেষায়িত স্কুল, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন থেকে অটিজম সংক্রান্ত সহায়তা পাওয়া যাবে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উন্নয়ন অংশীদার, সমাজহিতৈষী ব্যক্তি, অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅ্যাবিলিটিস বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের বিকাশে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির কল্যাণে সবাই আন্তরিক হলে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় তাদের সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে।

লেখক : প্রাবন্ধিক

বই প্রজন্মান্তরের সেতুবন্ধ

শংকরী ঘোষ

বই শুধু কাগজের উপর মুদ্রিত শব্দ বাক্যের ঝুড়ি নয়। বই মানুষের কল্পনা ও চিন্তার বিশুদ্ধতম প্রকাশ। অন্য সকল মাধ্যম হলো অনেক তত্ত্ব, তথ্য ও বিষয়ের সংমিশ্রণ কিন্তু বই হচ্ছে একক ও অকৃত্রিম। মানুষের মননশীল, চিন্তাশীল, সৃষ্টিশীল চিন্তার যাবতীয় সূচনার বিস্ফোরণ একমাত্র বইয়ের মাধ্যমেই হতে পারে। মানব সভ্যতার সূচনা থেকে মানুষের বই পাঠের তথ্য পাওয়া যায়। বই পড়া মানসিক প্রক্রিয়াকেও সক্রিয় রাখে ফলে মস্তিষ্ক চিন্তা করার খোরাক পায়, সৃজনশীলতা বাড়ে এবং তথ্য ধরে রাখার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। পৃথিবীতে যারা জগদ্বিখ্যাত সফল মানুষ হয়েছেন, তারাই বেশি বেশি জ্ঞান অন্বেষণে সময় দিয়েছেন। তাই বই হচ্ছে শেখবার, জানবার ও জ্ঞানার্জনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। একটি দেশ ও জাতি গঠনে বইয়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতির অগ্রগতি সম্ভব নয়। কথিত আছে, একটি রাষ্ট্র বা জাতিকে ধ্বংস করতে হলে পারমাণবিক বোমা লাগে না, মানহীন শিক্ষা ব্যবস্থাই যথেষ্ট। আর এ কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে বইয়ের শিক্ষা জাতীয় জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো ছড়াতে সমাজের জন্য বই নিঃসন্দেহে অপরিহার্য। মানবজীবনে বইয়ের গুরুত্বের কথা স্মরণ করে রুশ সাহিত্যিক লিও টলস্টয় বলেছেন, জীবনে মাত্র তিনটি জিনিসের প্রয়োজন– বই, বই এবং বই।

প্রতিবছর সারা বিশ্বে ২৩শে এপ্রিল 'বিশ্ব বই দিবস' পালন করা হয়। জাতিসংঘের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কোর উদ্যোগে ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতিবছর এই দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে। বই দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলো– বই পড়া, বই ছাপানো, বইয়ের কপিরাইট সংরক্ষণ করা ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়ানো। সর্বোপরি লেখক, পাঠক, প্রকাশকদের সম্পর্ক ঘনিষ্ট করা। এ দিবস পালনের অন্যতম লক্ষ্য– অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝে যোগসূত্র স্থাপন এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সাংস্কৃতিকগত সেতুবন্ধ রচনা করা। এ দিবস উপলক্ষে ইউনেস্কো এবং বই শিল্পের তিনটি প্রধান খাত– প্রকাশক, বই বিক্রয়কারী এবং গ্রন্থাগারগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা তাদের নিজস্ব উদ্যোগের মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপনের প্রেরণা বজায় রাখতে এক বছরের জন্য 'বিশ্ব বুক রাজধানী' নির্বাচন করে। ২০০১ সালে ইউনেস্কো স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ শহরকে প্রথম বিশ্ব বই রাজধানী ঘোষণা করে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর ওয়ার্ল্ড বুক ক্যাপিটাল অ্যাডভাইসরি কমিটির সুপারিশে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক আদ্রে আজুলে জর্জিয়ার রাজধানী তিবিলিসি শহরকে এক বছরের জন্য 'ওয়ার্ল্ড বুক ক্যাপিটাল-২০২১' ঘোষণা করেন। বিশ্ব বই দিবসের এ বছরের থিম– 'Share a story'। থিমটির উদ্দেশ্য আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে পাঠমুখী করা এবং নিজেদের মধ্যে মতামত বিনিময় করা।

বিশ্ব বই দিবসের মূল ধারণাটি আসে স্পেনের লেখক ভিসেন্ত ক্লাভেল আন্দ্রেসের কাছ থেকে। ১৬১৬ সালের ২৩শে এপ্রিল মারা যান স্পেনের বিখ্যাত লেখক মিগেল দে সের্বান্তেস। সের্বান্তেস তাঁর লেখা উপন্যাস *ডন কিহোটে* এর জন্য সারা বিশ্বে অমর হয়ে আছেন। ডন কিহোটে হলো পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিক উপন্যাস। আন্দ্রেস ছিলেন তাঁর ভাবশিষ্য। নিজের প্রিয় লেখককে স্মরণীয় করে রাখতেই ১৯২৩ সালের ২৩শে এপ্রিল থেকে আন্দ্রেস স্পেনে পালন করা শুরু করেন বিশ্ব বই দিবস। এছাড়া বিশ্ব সাহিত্য অঙ্গনে ২৩শে এপ্রিলকে প্রতীকীপূর্ণ একটা তারিখও বলা হয়। কারণ এ দিনেই উইলিয়াম শেক্সপিয়র, সত্যজিৎ রায়, ইনকা গার্সিলাসো ডে লা ভেগা প্রমুখ খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের প্রয়াণ দিবস। আবার বিখ্যাত নোবেলিস্ট মরিস ড্রুন, হালদোর কে. ল্যাক্সনেস, ভ্লাদিমির নবোকভ, জোসেপ প্লা, ম্যানুয়েল মেজিয়া ভাল্লেজো প্রমুখ সাহিত্যিকদের জন্ম দিবসও। আর এ কারণে অনেকে ধারণা করেন ২৩শে এপ্রিল তারিখটিকে বিশ্ব বই দিবস হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। এরপর কালক্রমে দাবি ওঠে প্রতিবছরই দিবসটি পালন করার। অবশেষে ১৯৯৫ সালে ২৩শে এপ্রিল ফ্রান্সের প্যারিসে ইউনেস্কোর সাধারণ সভায় দিনটিকে বিশ্ব বই দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং পালন করতে শুরু করে। এরপর থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের শতাধিক দেশে প্রতিবছর ২৩শে এপ্রিল বিশ্ব বই দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

২৩শে এপ্রিল বই দিবসের সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কপিরাইট দিবসও পালন করা হয়। কপিরাইট হলো মেধাস্বত্ব। মেধাসম্পদের সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষণের নামই হলো কপিরাইট। কপিরাইট দ্বারা মেধাসম্পদের ওপর প্রণেতার নৈতিক ও আর্থিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ওই মেধাসম্পদ বিভিন্ন পন্থায় পুনরুৎপাদন, বিক্রয়, বাজারজাতকরণ, লাইসেন্স প্রদান এবং জনসমক্ষে প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে প্রণেতা বা সৃজনশীল ব্যক্তি একচ্ছত্র অধিকার লাভ করেন। মেধাসম্পদের আইনগত স্বীকৃতি প্রদান, উত্তরাধিকারসূত্রে মালিকানা নিশ্চিতকরণ এবং এই আধুনিক যুগে পাইরেসি, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কপিরাইট সংরক্ষণ, রয়্যালটি আদায় এবং ব্রডকাস্টিং অর্গানাইজেশন থেকে ট্রান্সমিশন এবং রিট্রান্সমিশন সঠিকভাবে নিশ্চিতকরণে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কপিরাইট সাধারণত একটি সীমিত মেয়াদের জন্য কার্যকর হয়। ওই মেয়াদের পর কাজটি পাবলিক ডোমেইনের অন্তর্গত হয়ে যায়। ১৯৯৫ সালে ইউনেস্কো প্রতিবছর ২৩শে এপ্রিলকে বই দিবসের পাশাপাশি সব দেশে কপিরাইট দিবস হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে উদ্‌যাপন করার আহ্বান জানায়।

বিশ্ব বই দিবস ও কপিরাইট দিবস বাংলাদেশেও অনাড়ম্বরভাবে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। এ দিবস উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কপিরাইট অফিস এবং ঢাকার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনসহ বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে র‍্যালি, পাঠাভ্যাসের গুরুত্ব বিষয়ক আলোচনাসভা, দেয়ালপত্রিকা প্রকাশ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিশ্ব মহামারি করোনাভাইরাস মোকাবিলা সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশও করছে। বন্ধ রয়েছে বইয়ের বিচরণ কেন্দ্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। অন্যান্য বছরের মতো এ বছর দিবসটি সেভাবে পালিত না হলেও এদেশের সর্বস্তরের লেখক, প্রকাশক, সাহিত্যিক, পাঠক, মুদ্রাকর, ছাপাকর্মী, বইয়ের বিপণনকারী তথা বইয়ের সাথে সম্পৃক্ত সবার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। এই দিনে বইয়ের প্রতি ভালোবাসা থেকে প্রিয়জনকে বই উপহারের প্রবণতাও বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। তাই বিশ্ব বই দিবসের প্রত্যয় হোক–'বই পড়ি, জীবন গড়ি'।

লেখক : প্রাবন্ধিক

একটি মৃত সকাল ও বিদ্রোহী রহমাত খাঁ

শামস সাইদ

মহাসড়ক থেকে মাটির যে রাস্তাটা নেমে গেছে তার মুখে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক বটগাছ। এই রাস্তার মাথায় শানতলা গ্রাম। যার দুপাশে ফসলের ক্ষেত। তারপর বাড়িঘর। ভরা বর্ষায় জলের ছোয়া পেয়েছে মাঠ। ব্যস্ততা বেড়েছে কৃষকের। নেমে পড়েছে মহিষের হাল নিয়ে। কেউ আবার জোয়াল জুড়ে দিয়েছে গরুর কাঁধে। ধানের চারা তুলছে। নিচু জমিতে লাগাবে। উঁচু জমিতে পাট। ঝড় হাওয়া বয়ে যাচ্ছে ক্ষেতের মাথার ওপর দিয়ে। সবুজের আড়ালে লুকিয়ে আছে সোনালি আশ। দোল খাচ্ছে কৃষকের মুখে হাসি। স্বপ্ন। সড়ক দিয়ে ছুটে যায় ব্যস্ত গাড়ি। ছুটে চলে মানুষ।

আজকের সকালটা বড্ড নীরব। কেমন সুনসান। মহাসড়কে গাড়ি নাই। পড়ে আছে মৃত অজগরের মতো। বিলে নামেননি কৃষক। বাতাসে ওড়ে না

সুরের সাইরেন। থমকে আছে সব। রহমাত খাঁ দাঁড়িয়ে আছেন বট গাছের নিচে। মিনিট ত্রিশে হেঁটে দাঁড়িয়েছেন। ফজর পড়ে বের হয়েছিলেন। যেতে চাচ্ছিলেন পাশের গ্রাম লক্ষণপুর। মজিদকে ডাকবেন। ক্ষেতে কাজ করাবেন। কিন্তু মন টানছে না। কেমন আউলা-ঝাউলা লাগছে। আকাশ মেঘে ঢাকা। সকালটাকে মৃত্যু লাগছে। নড়ছে না। চোখ খুলছে না। অন্ধকারে ঢাকা। মনে হচ্ছে ঘনিয়ে আসছে দুর্যোগ। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বাড়ির পথ ধরলেন।

চিন্তিত মনে রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটছেন রহমাত খাঁ। ঘুম ভাঙতে শুরু করেছে গ্রামের। দু একজন মানুষও দেখা যাচ্ছে। কথা বলেননি কারো সঙ্গে। মিনিট পনেরো হেঁটে দাঁড়ালেন সতিসের দোকানের সামনে। দোকান খোলেনি সতিস। দোকানের সামনে শুয়ে আছে একটা কুকুর। তাকে দেখেও নড়ছে না। ভাবছিলেন সতিস এসেছে। ওখানে কিছুক্ষণ বসবেন। রেডিওর খবরটা শুনে বাড়িতে যাবেন। না হয় খবরটা ধরতে পারবেন না। সকাল সন্ধ্যা দুবেলা খবর শুনতে হয়। ওটা তার নেশা। রেডিও নিয়ে বসেন। বিবিসিই বেশি ধরেন। পা লম্বা করে হাঁটা শুরু করলেন। বাড়ি গিয়ে খবরটা ধরার চেষ্টা অস্থির করে তুলেছে। তেঁতুল তলার বাঁক পেরিয়ে আর একটু সামনে এলেন। তখন দেখা পেলেন সতিসের। হাতে রেডিও। যাচ্ছে দোকানে। খবর শুনতে সকাল সন্ধ্যা বেশ মানুষ জড়ো হয় দোকানের সামনে। বিক্রিও বাড়ে। রেডিওটা পেয়েছে শ্বশুরবাড়ি থেকে। ওটাই ছিল চাওয়া তার। নব ঘুরিয়ে স্টেশন ধরে ধরে গান শোনা অভ্যাস। বছর পাঁচেক হয়েছে এটার বয়স। বউ ছাড়া কেটেছে বহু রাত। রেডিওটা ছাড়েনি। বিয়ের পরেই বাঁধল যুদ্ধ। বউ নিয়ে চলে গিয়েছিল বনগাঁ। মাশির বাড়ি। ফিরেছে যুদ্ধ শেষে। যুদ্ধের আচ লাগেনি তার গায়ে। দেখেছে যুদ্ধের বীভৎস চিত্র। যা বহুদিন ছিল। তারপর দোকান করল। দুই বাচ্চার বাপও হয়েছে।

রহমাত খাঁ দাঁড়ালেন সতিসের সামনে। দেরি করলি যে আজ। তুই তো সকাল সকাল দোকান খুলিস সতিস।

রাতে ঘুমাতে পারি নাই কাকা। সকাল সকাল উঠব কী! রাতে কোথায় যেন বড্ড গোলাগুলি চলছে। ভয়ে ঘর ছেড়ে গোয়াল ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। শঙ্করকাকু বলেন, একাত্তরেও এত ভয় পাননি। এখন চারদিকে আতঙ্ক। কবে জানি দোকানটাও আগুনের পেটে চলে যায়।

মাথা নাড়লেন রহমাত খাঁ। এসব কারা করছে জানেন তিনি। দূরের কেউ না। চেনাজানা। তবে বলা যাবে না। তাহলে মাথা থাকবে না। খবরটা শুনতে চাচ্ছিলাম। সকালের খবর না শুনতে পারলে সারাদিন নিরামিষ নিরামিষ লাগে।

রেডিওটা ওখানেই চালু করল সতিস। সাতটা বাজেনি। মিনিট দশেক বাকি আছে। তখনই একটা আর্তনাদের চিৎকার ভেসে এল। তেঁতুল তলার বাঁক পেরিয়ে ডানদিকে মোড় নিয়ে যে রাস্তাটা নেমে গেছে তার দুইটা বাড়ি পরে জয়নালের বাড়ি। শব্দটা সেখান থেকে আসছে। কানখাড়া করলেন রহমাত খাঁ। কী হইলো আবার! খানিক পরে আরও একটা চিৎকার। হাঁটতে শুরু করলেন রহমাত খাঁ। অস্থির হয়ে। মোড় নিয়ে নেমে পড়লেন ডানের রাস্তায়। সতিস দাঁড়িয়ে আছে রেডিও নিয়ে। দাঁড়াতে বলেছেন রহমাত খাঁ। তুই দাঁড়া সতিস। দেখে আসি আমি। এমন জোড়ে চিৎকার করল কে!

রহমাত খাঁর পা থামল জয়নালের বাড়ি সামনে। তার আগে দুই বাড়ি পেছনে রেখে গেছেন। সেখানে মানুষের টের পাননি। বাড়ির সামনে কেউ নেই। হঠাৎ আবার চিৎকার। আর্তনাদ করে উঠল বাবা বলে। বাড়ির ভেতরে গেলেন রহমাত খাঁ। দেখছেন না মানুষ। চিৎকার করল কে! তাহলে ঘরের ভেতর। জয়নালের মাটির ঘর। উঠান পেরিয়ে দাঁড়ালেন ঘরের সামনে। ভেতরে কান্নার শব্দ। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ছুটে গেল সামনের রাস্তা দিয়ে। সমস্বরে আরও কয়েকটা কুকুর পাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটল পিছে। ঘোড়ার গতিতে দৌড়াচ্ছে।

জয়নালের ঘরের দরজা বন্ধ। ভেতরে কাঁদছে মানুষ। কৌতূহল বাড়ল রহমাত খাঁর। দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়লেন। কেউ এল না খুলে দিতে। হঠাৎ চোখ গেল ঘরের দক্ষিণে। ঘর থেকে খানিক দূরে কাঁঠাল গাছ। তার নিচে জমে আছে রক্ত। পড়ে আছে মগজ। ছিটকে কাঁঠাল গাছের ছালের ওপরও পড়েছে। রহমাত খাঁর দুটি চোখ স্থির হয়ে গেল। ভয়ংকর অলক্ষণ। সকালটা হলো রক্ত দেখে। উপরের চোখ তুলতেই আঁতকে উঠলেন। ঝুলছে জয়নালের লাশ। পরনে কাপড় নেই। মুখ বিকৃত। ঘাড়টা ভেঙে পড়েছে। শরীরের উপরিভাগে একটা গেঞ্জি জড়ানো। হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। ভাবলেন বেরিয়ে আসবেন জয়নালের বাড়ি থেকে। তখন আবার কান্নার আওয়াজ ঘরের মধ্যে। পা থেমে গেল। ঠেলা দিতেই খুলে গেল কপাট। সব ভয় কাটিয়ে ঢুকলেন ভেতরে। হাত পা বাধা পড়ে আছে জয়নালের ছেলে রফিক। মাঝঘরের খাটালে। পেছনের বারান্দায় জয়নালের বউ। তাদের মুক্ত করলেন। ভুলে গেছেন খবরের কথা। জানতে চাইলেন কী হয়েছে? জয়নালের লাশ দেখেছেন এড়িয়ে গেলেন তা।

রফিক বলল, আমার বাবা। কোথায় আমার বাবা। দৌড়ে বাইরে নামল। দেখল ঝুলছে বাবার লাশ। রহমাত খাঁ এসে পাশে দাঁড়ালেন। জানতে চাইলেন কী হয়েছিল রাতে?

একদল লোক এসে বাবাকে ডাকল জয়নাল বলে। বাবার চোখে ঘুম ছিল না। বিড়ি টানছিলেন। কিছু একটা নিয়ে চিন্তা করছিলেন খুব। ডাক শুনে থর থর করে কাঁপতে শুরু করলেন। দরজা খুললাম না আমরা। পেছনের দরজা ভেঙে ওরা উঠে পড়ল ঘরে। কালো পোশাকে ঢাকা শরীর। মুখ বাঁধা। ধরে ফেলল বাবাকে। বাধা দিয়েছিলাম আমি আর মা। বেঁধে ফেলল আমাদের। ফেলে রাখল ঘরের খাটালে। বাবাকে নামিয়ে নিল। তারপর কয়েকটা গুলির শব্দ শুনলাম। ওরা চলে গেল। বুটের শব্দ শুনেছি।

পাশের বাড়ি থেকে মহসিন বের হলো তখন। চোখে মুখে আতঙ্ক। কাঁপা গলায় বলল, আমি দেখেছি সব। দাঁড়িয়েছিলাম জানালায়। কয়েকজন মানুষ কালো পোশাক পরা। টানতে টানতে জয়নাল ভাইকে নামাল ঘর থেকে। আকুতি করেছিলেন বাঁচার। ওখানে দাঁড় করিয়ে গুলি করল। পড়ে গেলেন। হাত পা লাফাচ্ছিল খানিক। কয়েকবার গোঙ্গালেন। তারপর থেমে গেল সব। একজন উঠল কাঁঠাল গাছে। রশি ঝুলিয়ে দিল। একজন বেঁধে দিল গলায়। টেনে তুলল, এরপর ঝুলিয়ে রাখল গাছের সঙ্গে।

কিছু বলতে চাচ্ছিলেন রহমাত খাঁ। তখন শুনলেন সতিসের চিৎকার। ওর আবার কী হলো। সতিসকে গুলি করেনি তো। জয়নালের লাশ রেখে ছুটলেন সতিসের কাছে। তেঁতুল তলার ঝাঁক পেরিয়েই দেখলেন রাস্তায় পড়ে আছে সতিস। দৃষ্টিসীমায় মানুষ নেই। ভয়ে সামনে গেলেন না। ভাবছেন সতিসকেও মেরে ফেলল। দিন দুপুরে। সবাইকে মারবে ওরা। পুলিশ আসুক। তারা দেখুক। চিৎকার তো শুনলেন সতিসের। গুলির শব্দ শুনলেন না। কুপিয়ে মারছে তাহলে। কয়েক মিনিটের ব্যাপার। তারজন্যই দাঁড়িয়েছিল সতিস। খবরটাও শুনতে পারলেন না। পেছনে ফিরতেই দেখলেন গফুর আর তোফাজ্জেল দাঁড়িয়ে আছে। চিৎকার শুনেই ছুটে এসেছিল

তারা। আতঙ্কিত কণ্ঠে জানতে চাইল গফুর, খাঁ সাইব, এত জোড়ে চিৎকার করল কে?

রহমাত খাঁ দাঁড়িয়ে আছেন। বছর পঞ্চাশের মানুষটা হঠাৎ দিক হারিয়ে ফেললেন। কোন আওয়াজের কথা কইবেন। আওয়াজ তো দুইটা হইছে। সকাল সকাল দুইটা মানুষ খুন হইছে। আওয়াজটা তোরা শুনতে পাইছ! বড়ো দুর্যোগ সামনে গফুর। আঙুল তুলে বললেন, ওই যে রাস্তার দিক থেকে এল আওয়াজটা। সকালটা কত ভয়ংকর। জয়নালের লাশ ঝুলছে কাঁঠাল গাছে। মগজ পড়ে আছে নিচে।

কী বলেন খাঁ সাইব। চোখ বড়ো হয়ে গেল গফুরের। বছর চল্লিশের তাগড়া যুবক সে। রক্ত ছুটছে শরীরে বিদ্যুৎ গতিতে। আওয়াজ এল তেঁতুল তলার ঝাঁক পেরিয়ে। জয়নালের লাশ ঝুলছে কাঁঠাল গাছে। কিছু বুঝতে পারল না।

বিশ্বাস হয় না আমার কথা? এক বর্ণও মিথ্যা না। নিজের কানে শুনেছি। জয়নালের লাশ আমি দেখেছি। ওই চিৎকারটা সতিসের ছিল। বুক ফাটা আর্তনাদ।

মহিষের হাল নিয়ে বিলে নামছে রফেজ। সারা বিলে আর কোনো হাল নাই। রমিজা খাতুন বের হয়েছেন ছাগল নিয়ে। রাস্তার ধারে বেঁধে হাঁটলেন। লক্ষীগো বাড়ি যাবেন। পান আনবেন। কাল রাতে পান মুখে দিতে পারেননি। ওটা না হলে চলে না তার। ভাত না হলে চলে। তেঁতুল তলার বাঁকে এসে পা থামল তার। দেখলেন ওরা দাঁড়িয়ে আছে। ফিসফিস করে কিছু বলছে। কিছু জানতে চাইলেন না তিনি। রহমাত খাঁ বললেন, রাস্তার মুখে চলো। দেখি সতিস বেঁচে আছে কিনা।

সবাইকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন রহমাত খাঁ। তাদের পেছনে গেলেন রমিজা খাতুন। তখন আরও কয়েকজন দাঁড়াল সতিসকে দেখে। তারাও যাচ্ছিলেন রাস্তা দিয়ে। সতিস পড়ে আছে হাত পা বিছিয়ে। ছুটে গিয়ে ধরল গফুর। কেন মরবে সতিস! গুলির চিহ্ন নেই। নেই কোপেরও। দেখছে না রক্তও। নাকে হাত দিল। বেঁচে আছে। চিৎকার করে বলল, সতিস মরে নাই রহমাত চাচা। রহমাত খাঁ খুঁজছেন রেডিও। সেটা কোথায়। নিয়ে গেল কেউ। দেখলেন পড়ে আছে রাস্তার পাশে। তখনো চলছে। খবর শেষ। চলছে দেশাত্মবোধক গান।

সতিসকে তুলে দোকানের সামনে নিয়ে গেল গফুর। শোয়াল বেঞ্চের ওপর। মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল মনে হয়। চোখে মুখে জলের ছিটা দিলে জ্ঞান ফিরবে। জল নিয়ে এল তোফাজ্জেল। ছিটিয়ে দিলেন রহমাত খাঁ। বেলা বাড়তেই আরও কয়েকজন মানুষ জড়ো হয়েছে। খানিক পরে জ্ঞান ফিরল সতিসের। আতঙ্ক দূর হলো। গফুর জানতে চাইল কী হয়েছিল? রাস্তায় পড়ে রইলি কেন সতিস?

গফুরকে থামালেন রহমাত খাঁ। ওরে ধাতস্ত হতে দেয়।

সারা শরীর ঘামছে সতিসের। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। খুব জোড়ে জোড়ে নিশ্বাস ছাড়ছে। নিশ্বাস দিয়ে বেরিয়ে আসছে আর্তনাদ। উদভ্রান্তের মতো তাকিয়ে আছে। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সতিস। না। তা যেন না হয়। আবার জ্ঞান হারাল। রহমাত খাঁ বুঝতে পারলেন কোনো খবর সতিসকে অস্থির করে তুলেছে। মেনে নিতে পারছে না। কী খবর শুনল? কে আসছিল সতিসের কাছে? না রেডিওতে কিছু শুনল। গোঙানির আওয়াজ বের হচ্ছে সতিসের মুখ থেকে। চোখ ভয়ংকর অস্বাভাবিক। কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসল আবার। জড়িয়ে ধরল রহমাত খাঁকে। সর্বনাশ হয়ে গেছে খাঁ সাব। সর্বনাশ হয়ে গেছে। শুনছেন আপনি?

অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন রহমাত খাঁ। কী হয়েছে? কী বলছে সতিস? সতিস চিৎকার করে উঠল, বঙ্গবন্ধু নাই। তাকে মেরে ফেলেছে।

আচমকা এই খবরে হতবিহ্বল হয়ে পড়লেন উপস্থিত সবাই। কেউ বিশ্বাস করলেন না। সতিসের মাথা নষ্ট হয়েছে। ওর মাথায় জল দিতে হবে। বললেন রহমাত খাঁ। তখন হাঁপাতে হাঁপাতে সামনে দাঁড়াল সাজ্জাদ। যশোর থেকে এসেছে সে। সব গাড়ি বন্ধ। কারফিউ দিয়েছে। সেনাবাহিনী নেমেছে শহরে। কী হয়েছে কিছু বুঝতে পারছি না। দেশের অবস্থা ভালো না। আপনারা এখানে থাইকেন না। বাড়িতে চলে যান।

অবাক চোখে সাজ্জাদের দিকে তাকাল সবাই। এবার সবার মনে জন্ম নিতে থাকল অদৃশ্য বিশ্বাস। বঙ্গবন্ধুকে সত্যি মেরে ফেলেছে তাহলে। কিন্তু রহমাত খাঁ মানতে পারছেন না। তার চোখে ভাসছে বঙ্গবন্ধুর মুখ। সেই হাসি। তার কাঁধে বঙ্গবন্ধুর হাত। রসিক কণ্ঠে বলছেন, রহমাত, তোর ওপর আল্লাহর রহমাত আছে। তোর ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। আওয়ামী লীগের জন্য যা করেছিস মনে থাকবে আমার। যশোর এলেই তাকে খুঁজতেন বঙ্গবন্ধু।

রহমাত খাঁ চালু করলেন রেডিও। চেষ্টা করছেন খবর ধরার। খবরটা মিথ্যা হোক। ওরা যা বলছে তা ভুল হোক। এটা হতে পারে না। কে খুন করবে মুজিব ভাইকে। তখনই শুরু হলো খবর। একটা ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠ থেকে বলে যাচ্ছে, শেখ মুজিব আর নেই। একদল সেনা সদস্যের হাত নিহত হয়েছেন। ভোর রাতে। তার বাড়িতে। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে।

রেডিওটা মাটিতে ছুড়ে মারলেন রহমাত খাঁ। চিক্কর দিয়ে বসে পড়লেন রমিজা খাতুন। মাটিতে দুহাত আছড়ে বলতে থাকলেন, হায় আল্লাহ, এ তুমি কী করলা। আমার ঘর নাই। শেখ সাইব পাঁচশ টাকা পাঠালেন। সেই টাকায় ঘর তুললাম। শেখ সাইবরে কারা মারল? কেন মারল? আল্লাহ তাকে জান্নাত দাও। যারা মারছে তাদের ওপর গজব পড়ুক। বিলাপ করে কাঁদছেন। দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে তার বুকের ভেতর।

সাজ্জাদ বুঝতে পারল বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলেছে। তাই সেনাবাহিনী নেমেছে। সারা দেশ দখলে নেওয়ার চেষ্টা। কারফিউ দিয়েছে। ঝিমিয়ে পড়া রহমাত খাঁ হঠাৎ বিপ্লবী হয়ে উঠলেন। প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল তার বুকে। তীব্র উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, প্রতিবাদ হবে। জীবন দিয়ে হলেও প্রতিবাদ করব। অন্যরাও চিৎকার করে উঠল। প্রতিবাদ হবে। প্রতিশোধ নেব। বঙ্গবন্ধুর রক্তের বদলা নেব।

সাইকেল থেকে তখন নামলেন শঙ্করবাবু। আতঙ্ক তার চোখে মুখে। বড্ড রোগা পাতলা শরীর। মাস্টারি করেন যশোরের এক স্কুলে। সকালে এই খবর শুনে ঘামতে ছিলেন। একটু জল মুখে দিয়ে ভাবলেন চলে যাবেন শানতলা। এখানে নিরাপদ না। বের হলেন বাইরে। সদর দরজায় তালা লাগিয়ে তাকালেন পথের দিকে। কোনো মানুষ দেখছেন না। আশপাশের ঘরের দরজা জানালা বন্ধ। ভয়ে ঘামছেন। কপালে চিন্তার ভাজ। যেতে পারবেন তো। সাইকেলটা নিয়ে বের হলেন। রাস্তাটা ফাঁকা মনে হচ্ছে। উঠে পড়লেন সাইকেলে। ফোটায় ফোটায় বৃষ্টি পড়ছিল তখন। তবু থামেননি। ওটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। সাইকেল নিয়ে এক প্রকার পালিয়ে এসেছেন। একটু স্থির হয়ে মুখটা গম্ভীর করে বললেন, শেখ সাহেবের পরিবারে কেউ নেই খাঁ সাইব। শুধু শেখ সাহেব না, সবাইকে মেরে ফেলেছে।

তখন আবার সব থেমে গেল। মেঘে জমা আকাশটা ভেঙে পড়ল রহমাত খাঁর মাথায়। পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলেছে? তা কেন? কেন এত আক্রশ! কাউকে বাঁচতে দিল না।

তা জানতে পারিনি। তবে শুনেছি সবাইকে মেরে ফেলেছে। ছোটো ছেলে রাসেলও রক্ষা পায়নি।

মুজিব ভাইয়ের লাশ কোথায়?

তা কেউ জানে না। শহরের অবস্থা ভালো না। কারফিউ দিয়েছে। সেনারা নেমেছে ট্যাঙ্ক নিয়ে। বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ওদের পাহারায়। ভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে মানুষ। যশোরেও থাকতে পারিনি। এই খবর শুনে বঙ্গবন্ধুবিরোধীরা উল্লাস করছে। পথে অনেককে কাঁদতে দেখেছি। বিলাপ করছে। চাপা কান্নায় ভার হয়ে আছে অনেকের বুক। মুখে চোখ রাখা যায় না। কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না। এই জন্য দেশটা স্বাধীন করেছিলেন! স্বাধীন দেশে জীবন দিতে হলো। তাও আবার সপরিবারে। মোশতাক প্রেসিডেন্ট হয়েছেন।

রহমাত খাঁর উত্তেজনা হঠাৎ বেড়ে গেল। ভয়ে কুকড়ে যাননি। খুব জোড়ে চিৎকার দিয়ে বললেন, মোশতাক গাদ্দার হে। শহরে যাব আমি। প্রতিশোধ নেব। দাঁড়াব ওদের ট্যাঙ্কের সামনে। যে দেশে শেখ সাহেব নাই সে দেশে কী করে থাকব আমি। এটা আমার দেশ না। আমিও মরব। প্রতিশোধ নিয়ে মরব। তার পাশে এসে দাঁড়াল গফুর। ছুটে এল সাজ্জাদ। আরও অনেকে। প্রতিশোধ নিবে তারাও। উঠে দাঁড়াল সতিস। বলল, এবার পালিয়ে বনগাঁ যাব না কাকা। লড়াই করব। তখনই মৃত মহাসড়কটা জীবন্ত হয়ে উঠল। ছুটে চলছে সেনাবাহিনীর গাড়ি। দানবের গতিতে ছুটছে। রহমাত খাঁ নিজেও শুনতে পাচ্ছেন মাহসড়ক থেকে একটা দানবীয় আওয়াজ এগিয়ে আসছে। শঙ্করবাবু বললেন, এখান থেকে সরে পড়ুন খাঁ সাব। ওরা চলে আসবে। ওদের হৃদয় নাই। শেখ সাহেবকে মারতে পেরেছে। কাউকে বাঁচিয়ে রাখবে না। এতটা দয়া ওদের অন্তরে নেই। ওরা মানুষ না। দানব।

রহমাত খাঁ হাঁটতে শুরু করলেন। তার পেছনে অন্যরা। ভয় উত্তেজনায় কাঁপছে সবাই। শানতলা গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়েছে শেখ সাহেব নাই। তাঁকে মেরে ফেলেছে। রমিজা খাতুন বলে গেছেন পথে পথে। প্রায় পাগল হয়ে ছুটছেন তিনি। তেঁতুল তলার বাঁক পেরিয়ে ডানদিকে চলে গেলেন রহমাত খাঁ। জয়নালের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। কাতরকণ্ঠে বললেন, বঙ্গবন্ধুকে যারা মেরেছে তারাই জয়নালকে মেরেছে। জয়নাল ছিল বঙ্গবন্ধুর পাগল। বঙ্গবন্ধুর পাগল আজ নাই। বঙ্গবন্ধুও নাই। চোখে তার জল। কণ্ঠটা ভিজে গেল। বঙ্গবন্ধুর অনুসারী সবাইকে মারবে ওরা। প্রতিটা খুনের প্রতিশোধ নেব। প্রতিশোধ নিয়ে মরব। শোক ও বেদনা ঝেড়ে ফেলে বললেন, আজ রাত হবে প্রতিশোধের রাত। তৈরি হও তোমরা।

২

দুপুর মাথার ওপর উঠে গেছে। সূর্যের তখনো দেখা মেলেনি। আকাশের গায়ে লেপটে আছে মেঘ। জয়নালের লাশ ঝুলছে। কেউ নামাতে যায়নি। থানায় খবর গেছে তবু আসেনি পুলিশ। মাতালের মতো ছুটে গিয়েছিল রফিক। বাবার লাশ নামিয়ে আনবে। সে দেখতে পাচ্ছে না বাবার উলঙ্গ শরীর। পুলিশের অপেক্ষায় থাকবে না। প্রতিশোধ নিজেই নিবে। ওদেরও খুন করবে। বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নেবে। বাধা দিলেন রহমাত খাঁ। লাশ নামাইস না রফিক। পুলিশ আসুক। খুনের মামলা।

অগ্নিমূর্তি হয়ে রফিক দাঁড়াল রহমাত খাঁর সামনে। পুলিশ না, প্রতিশোধ আমি নেব কাকা। সময় এখন প্রতিশোধের।

রহমাত খাঁর ভেতরে তখনো জ্বলছে আগুন। সে আগুন প্রতিশোধের। দেখছে না কেউ। তবে আগুন রহমাত খাঁর মুখ চোখ থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। অগ্নিঝরা কণ্ঠে বললেন, প্রতিশোধ নেব রফিক। আগে তোর বাবাকে কবর দিয়েনি।

আজান পড়েছে জুমার। তার খানিক আগে এল পুলিশ। নামিয়ে নিল জয়নালের লাশ। শানতলা গ্রামের মানুষ জড়ো হয়েছিল রাস্তায়। বঙ্গবন্ধু হত্যার খবরে পুরো জাতি শোকার্ত। নিস্তব্ধ। তারপর আবার জয়নালের খুন। পাথর চাপা পড়েছে সবার মাথায়।

বাড়ি ফিরলেন রহমাত খাঁ। গোসল করে গেলেন মসজিদে। মসজিদ প্রায় ফাঁকা। জনা পঁচিশেক লোক এসেছে। করো মুখে কথা নাই। চুপচাপ বসে আছেন। মোখতার ব্যাপারি বেশ উৎফুল্ল। কয়েকবার তার মুখের দিকে তাকালেন রহমাত খাঁ। বুঝতে পারলেন আজ ওদের বিজয়ের দিন। একাত্তরে পারেনি। পঁচাত্তরে পারল। আনন্দ তো হবেই। নামাজ শেষ হলো। থমথমে পরিবেশ। ইমাম সাহেব কিছু বলছেন না। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন রহমাত খাঁ। বজ্রকণ্ঠে বললেন, ইমাম সাহেব হুজুর, মুজিব ভাই সপরিবারে শহিদ হয়েছেন। তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করেন।

ইমাম সাহেব কিছু বলছেন না। মিনমিন করছেন। প্রতিবাদ করে দাঁড়ালেন মোখতার ব্যাপারি। কিসের দোয়া। শেখ মুজিব তার কর্মফল ভোগ করছেন।

উত্তেজিত হয়ে উঠলেন রহমাত খাঁ। তেড়ে গেলেন মোখতার ব্যাপারির সামনে। তোর গলাটা ছিড়ে ফেলব মোখতার। এতদিন কথা ছিল না মুখে, আজ কথা ফুটছে। তুই এখনো বেঁচে আছিস এটা তোর ভাগ্য। মুজিব ভাই ক্ষমা করছিলেন। তোদের মতো কুত্তা ক্ষমার অযোগ্য। একাত্তরেই তোদের মেরে ফেলা উচিত ছিল। শয়তান কখনো ভালো হয় না।

সবাই ছুটে এসে রহমাত খাঁকে থামালেন। খাঁ সাইব, শান্ত হন। মোখতার ব্যাপারিকে সরিয়ে দিলেন। রহমাত খাঁ কিছু বললেন না। এক কোণায় চুপচাপ বসলেন। দুহাত তুলে মোনাজাত ধরলেন। হে আল্লাহ বলে থেমে গেলেন। কথা বলতে পারছেন না। গলা ধরে আসছে তার। শব্দ করে কেঁদে উঠলেন হঠাৎ। কাঁদছেন শিশুর মতো হাউমাউ করে। সকাল থেকে তার বুকে জ্বলছিল আগুন। সেই বুকে এত জল কখন জমল। জানেন না। সে কান্না আর থামছে না। সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। একে একে চলেও গেল। পড়ে রইলেন রহমাত খাঁ। বুকটা তার ভেঙে যাচ্ছে। কোনো অনুভূতি নাই। ক্ষুধা নাই। সকাল থেকে পেটে পড়েনি দানাপানি। তবু নড়ছেন না।

অনেকক্ষণ পরে উঠে ধীর পায়ে বিষণ্ন মনে রহমাত খাঁ হাঁটলেন বাড়ির পথে। ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তার স্ত্রী বললেন, জিকরুল হাকিমের মেয়ের বিয়ে। মনে আছে আপনার! দাওয়াত দিয়েছিল। যাবেন না?

হু হু করে উঠল রহমাত খাঁর বুকের ভেতর। মুজিব ভাইর লাশ পড়ে আছে সিঁড়িতে। তিনি ভাত খাবেন বিয়ে বাড়িতে। পারবেন না। এই হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে ভাত খাবেন না। প্রতিজ্ঞা করে বের হলেন। গেলেন বিলের মাঝে গফুরের বাড়ি। বাড়িতে একটাই ঘর গফুরের। বছর দশেক আগে পুরান বাড়ি ছেড়ে এখানে এসেছে। কিছুটা নিরাপদ মনে হলো। মোখতার দল ভারি করবে। রাস্তায় বের হবে। লড়াই হবে এখানেও। ফিরে যাবেন সেই একাত্তরে। সবাইকে ডাকলেন। বললেন মসজিদে কী হয়েছে। মোখতারকেও শিক্ষা দিতে হবে। শয়তান ভালো হয় না। একাত্তরের রাজাকার।

ক্ষমা করেছিলেন মুজিব ভাই। আজ তাদের মুখে হাসি। মুজিব ভাই নাকি তার কর্মফল ভোগ করছেন। প্রতিশোধ নেব এবার। সবাই মুখ বুঝে থাকলেও এই রহমাত খাঁ বসে থাকবে না। শেখ মুজিব হত্যার বদলা নেব। শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকা অবধি লড়াই করব।

সেই বিকেলে ব্যাপক প্রস্তুতি নিলেন রহমাত খাঁ। গফুরকে বললেন বাঁশ কেটে লাঠি বানা। সবার হাতে থাকবে বাঁশের লাঠি। এটাই তাদের অস্ত্র।

গফুর বলল, চাচা, ওদের কামানের সামনে দাঁড়াতে পারব বাঁশ নিয়ে?

কিছুক্ষণ ভাবলেন রহমাত খাঁ। এরপর বললেন, বাঁশ দিয়ে প্রতিবাদ করব না গফুর। প্রতিবাদ করব হৃদয় দিয়ে। ওই প্রতিবাদ কামান দিয়ে ফিরাতে পারবে না। আমাদের হৃদয়ে যে আগুন জ্বলছে তা ওদের কামানের গোলার থেকে শক্তিশালী।

থেমে গেল গফুর। ঠিক ওই কামান দাঁড়াতে পারবে না তাদের সামনে। সর্ব শক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করবে তারা।

বাঁশের লাঠি বানাল গফুর। সন্ধ্যা তখনো নামেনি। আকাশ বড্ড মেঘলা। সূর্য আজ ওঠেনি। এই সময় এল রফিক। একটা বাঁশের লাঠি তুলে নিল হাতে। চোখে মুখে প্রতিবাদের তীব্র উত্তেজনা। যার বাবার লাশ মর্গে। ভেঙে পড়া উচিত তার। সে জ্বলে উঠছে ক্ষিপ্র গতিতে। দাঁড়াল রহমাত খাঁর সামনে। চলেন চাচা, প্রতিশোধ নেব। দেরি করা যাবে না। ওদের কাউকে বাঁচিয়ে রাখব না। শহরে আগুন জ্বালিয়ে দেব। যারা রাস্তায় নামবে না, প্রতিবাদ করবে না, তারাই শত্রু। ওদের মারব।

রফিককে থামালেন রহমাত খাঁ। রফিক। এখনো সময় হয়নি প্রতিশোধের। রাতটা নেমে আসুক।

রাতে কেন কাকা! আপনি ভয় পান ওদের? আমি ভয় পাই না। আমার হারানোর কিছু নাই। সব হারিয়েছি। আমার বাবাকে হারিয়েছি। হারিয়েছি বঙ্গবন্ধুকে। আমাদের ওই মাটির ঘরে একদিন বসছিলেন বঙ্গবন্ধু। আপনার মনে আছে কাকা? বাবা ভাত খাওয়াতে চাইলেন। বঙ্গবন্ধু বললেন, সময় হবে না জয়নাল। ডাব খাওয়া। দৌড়ে গিয়ে ডাব গাছে চড়ছিলাম আমি। ওই মানুষটাকে মারতে পারল! কাঁপল না ওদের হাত!

রহমাত খাঁর উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। উঠে দাঁড়ালেন। প্রতিশোধের আগুনে পোড়ছেন তিনি। এই সময় সাজ্জাদ এল। বলল, আন্দোলন এভাবে হবে না কাকা। বাঁশের মাথায় পাট পেচাতে হবে। তাতে কেরাসিন মেখে শহরে ঢুকব আমরা। মিছিল দেব। মশাল মিছিল।

এটা ভালো আইডিয়া। আগুন জ্বালিয়ে দেব। যে আগুন আমাদের ভেতরে জ্বলছে। সে আগুন ছড়িয়ে পড়বে শহরের অলিতে গলিতে।

গফুর বলল, এত তেল কোথায় পাবা চাচা?

সাজ্জাদ বলল, তেলের অভাব হবে না। আমরা ট্রাকস্টান্ড যাব। অনেক ট্রাক থামিয়ে রাখছে। ট্যাঙ্ক থেকে নামিয়ে আনব তেল। পুরনো টায়ার জমা করে আগুন জ্বালাব।

হ্যাঁ তাই করব। গাদ্দার মোশতাক দেখবে শেখ মুজিব হত্যার প্রতিবাদ কেমন হয়। শহরের সব সড়কে আগুন জ্বলবে। জ্বালিয়ে দেব ওদের কামান। ওরা পালিয়ে যাবে। মুজিব ভাইয়ের আত্মা শান্তি পাবে। আমরা ভুলিনি মুজিব ভাইকে। তাঁর মৃত্যুর বদলা নিয়েছি। বলতে পারব।

এই সময় সতিস এল। তার পেছনে শঙ্করবাবু। সতিস বলল, আমি বিদ্রোহী হব কাকা।

শঙ্করবাবু বললেন, খাঁ সাইব, আগুন তো আমাদের বুকেও জ্বলে। করতে পারছি না কিছু। আপনি বিদ্রোহ করবেন। পারবেন ওদের সামনে দাঁড়াতে? সব শত্রু এক কাতারে দাঁড়িয়েছে। ওরা মরণ কামড় দেবে। যারা শেখ সাহেবের ভক্ত তাদের মারবে।

আমি জানি শঙ্করবাবু। মরবই তো। আজ জয়নাল মরেছে। কাল আমি। পরশু গফুর। তারপর আপনি। রক্ষা পাবেন না কেউ। না হয় বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে হবে। তার থেকে লড়াই করি। বিদ্রোহ করে মরি। নিজের আত্মাও শান্তি পাবে। আমার ভেতরে যে আগুন জ্বলছে তা আমাকে পুড়িয়ে মারবে। বাঁচতে পারব না।

তা ঠিক বলেছেন খাঁ সাইব। আওয়ামী লীগের অনেক নেতা গা ঢাকা দিয়েছে। কলকাতাও চলে যাচ্ছে।

যাক। সবাই প্রাণ বাঁচাতে চায়। এই রহমাত খাঁর প্রাণের কী মূল্য আছে। আপনি জানেন না শঙ্করবাবু। এখনো মুজিব ভাইর হাত আমার কাঁধে। ওই হাসি মুখটা চোখে। খট খট করে হাসছেন। বুকে জড়িয়ে নিচ্ছেন আমাদের। কেমনে ভুলব ওই মানুষটার কথা। পারব না ভুলতে। চোখে তার জল। সামনের অগ্রহায়ণে যেতে চাচ্ছিলাম ঢাকায়। মুজিব ভাইর জন্য খেজুরের রস আর গুড় নিয়ে। কার কাছে যাব। যাওয়ার আর জায়গা নেই। মুজিব ভাই আর বলবেন না, রহমাত তোর ওপর আল্লাহর রহমাত আছে। সেই চুয়ান্নর নির্বাচনের সময় মুজিব ভাইকে দেখি প্রথম। বুকে টেনে নিয়েছিলেন। কোনো দিন ভুলে যাননি। দূরে ঠেলে দেননি। আমরাও ছাড়িনি মুজিব ভাইকে। আন্দোলন সংগ্রাম করেছি তার জন্য। গ্রেপ্তার করতে দেইনি আইয়ুব খানের পুলিশকে। বিমানবন্দরের সামনে আন্দোলন করে রেখে দিয়েছি। উনসত্তরে অভ্যুত্থান করে মুজিব ভাইকে মুক্ত করে এনেছি। সেই স্বাধীন দেশে আজ তাঁর জীবন দিতে হলো। ওই গাদ্দার মোশতাককে ছাড়ব না। প্রতিশোধ নেব। প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে আমার বুকে। মুজিব ভাইর ওই কথাগুলো বড়ো বেশি বুকে বাজে। ভুলতে পারি না।

শঙ্করবাবু কিছু বললেন না। হাত দিলেন পকেটে। বের করলেন একটা চাবি। রহমাত খাঁর হাতে দিয়ে বললেন, এটা রাখেন। শহরে আমার বাসার চাবি। বাসা সতিস চেনে। বিদ্রোহ করলেও একটা আশ্রয় লাগে। ওখানে নিতে পারবেন।

চাবিটা হাতে নিলেন রহমাত খাঁ। এটা খুব দরকার হবে।

৩

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে। চারপাশ কেমন নীরব। জমে আছে ভয়। আতঙ্ক। রহমাত খাঁ নামলেন গফুরের উঠানে। তার সামনে একদল বিদ্রোহী। তাদের হাতে বাঁশের লাঠি। বললেন, আজ আমরা প্রতিবাদ করব। প্রতিবাদ শহরে করতে হয়। গ্রামে করলে হয় না। মিছিল করব। মশাল মিছিল। আগুন জ্বলবে শহরের পথে পথে। আমরা স্লোগান দেব, মুজিবের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। আমরা সবাই মুজিব সেনা, ভয় করি না বুলেট বোমা। জ্বালো জ্বালো, আগুন জ্বালো। তারপর জ্বালিয়ে দেব আগুন।

রাত বাড়তেই বের হলেন রহমাত খাঁ। তার পেছনে অন্যরা। এক পথে হাঁটলেন না। কয়েক জন রাস্তায়। কেউ নেমে পড়েছে বিলের মধ্যে। চাষের জমি পেড়িয়ে যাচ্ছে মহাসড়কে। কেউ আবার পাট ক্ষেতের ভেতর। সবাই জড়ো হবে রাস্তার মুখে। রহমাত খাঁ এসে দাঁড়ালেন বটগাছের নিচে। দেখলেন গফুরের কুকুরটা তার পাশে।

তাকালেন বিলের দিকে। কোথাও একটু আলো নাই। মৃত্যুপুরী। মানুষের শ্বাসের শব্দও নাই। উঠলেন মহাসড়কে। মাইল খানেক হাঁটলেই পৌঁছে যাবেন শহরে। কুকুরটা দৌড়াচ্ছে তাদের সামনে। খানিক সামনে যেতেই দেখলেন কিছু একটা ছুটে আসছে। আর্মির গাড়ি ছাড়া এই রাতে কারফিউর মধ্যে কেউ বের হবে না। শব্দ নাই। আলোও জ্বলছে না। গাড়িটা চলে আসছে প্রায় সামনে। রাস্তার পাশে শুয়ে পড়লেন তারা। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে উঠল। হঠাৎ গুলির শব্দ। গুলি খেয়ে কুকুরটা লাফিয়ে পড়ে গেল রাস্তার পাশে। শেষ আকুতি শুনতে পাচ্ছেন তারা। ঘেউ ঘেউ করে থেমে গেল। গাড়ি চালিয়ে সামনে চলে গেল ওরা। মাথা তুললেন রহমাত খাঁ। দেখলেন রাস্তা ফাঁকা। উঠে এলেন পুরো শরীর নিয়ে। কুকুরটাকে দেখছেন না। মেরে ফেলেছে। কষ্ট পেলেন। হাঁটতে শুরু করলেন আবার।

আকাশে মেঘ ডাকছে। হঠাৎ বৃষ্টিও শুরু হলো। তবু থামলেন না। অনেকটা সামনে চলে এসেছেন। আর কিছুক্ষণ পরেই ঢুকে পড়বেন শহরে। শহরের পয়েন্টে পয়েন্টে সেনাবাহিনীর গাড়ি। তাই রাস্তা ছাড়লেন। নেমে পড়লেন বিলে। ঘুরে অন্য রাস্তা দিয়ে গেলেন ট্রাকস্টান্ড। পচা পুকুরটার পাশে অনেকগুলো ট্রাক থামানো। ঘুরে দেখলেন পুরান টায়ারও আছে। তিনটা গ্রুপ করলেন। এক গ্রুপ পাহারা দিবে। আর এক গ্রুপ ট্রাক থেকে তেল নামাবে। বাকিরা পুরান টায়ার জড়ো করবে।

শহরের পথে আজ কোনো বাতি জ্বলেনি। অন্ধকার। তার মধ্যে দানবের মতো ঘুরছে আর্মির গাড়ি। দোতলার জানালা খুলে বসে আছেন আব্দুস সাত্তার। সন্ধ্যায় বসেছেন তিনি। তারপর ওঠেননি। সকাল থেকে একটা কথাও বলেননি। সারা দিন বসেছিলেন রেডিও নিয়ে। শুনছেন সেই একটা খবর। বিশ্বাস করতে পারেননি। তবু কেন জানি বারবার শুনে যাচ্ছেন। তার কোনো অনুভূতি নেই। হারিয়ে ফেলেছেন চেতনা। শহরের বুকের ওপর ছুটে চলছে আর্মির গাড়ি। সন্ধ্যার হালকা আলোতে দেখতে পাচ্ছিলেন। সেটা মুছে গিয়ে অন্ধকারটা ঘন হয়েছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না। তবু তাকিয়ে আছেন। দেখছেন অন্ধকার। তার বউ এসেছিলেন একবার। সারা দিন তো খবরই শুনলেন। এখন একটু কিছু খান। ঘুমান। এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকা ঠিক না।

তুমি যাও। আমাকে থাকতে দাও। ভাত মুখে তুলতে পারব না। জোর করে সব পারা যায় না। মানুষ মারা যায়।

একটা কুকুর ডেকে উঠল হঠাৎ। দূরে একটা গুলির শব্দ। শহরের পথে তাহলে মানুষ আছে। সবাই ঘুমিয়ে যায়নি। তার মতো অনেকেই জেগে আছে। কেউ নামল না কেন প্রতিবাদ করতে! অথচ মুজিবের জন্য কত পাগল ছিল মানুষ। কেন সবাই চেতনা হারিয়ে ঘরে বসে রইল? কেন তিনি বসে আছেন অন্ধকারে? তার তো নামা উচিত ছিল পথে। প্রতিবাদের কণ্ঠ উঁচিয়ে বলা উচিত জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। কেন বলতে পারলেন না। তখন আবার মনে হচ্ছে রাস্তায় নামবে মানুষ। সবাই ঘরে বসে থাকব না। প্রতিবাদ করবে।

অনেকগুলো পুরনো টায়ার জড়ো করল গফুর। রহমাত খাঁ বললেন, শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে রেখে আসবি। কেরাসিন নিয়ে যা। ছিটিয়ে দিবি টায়ারের ওপর। সতিসকে বললেন মশাল কেরাসিনে ভিজাতে। মিছিল নিয়ে যাব আমরা। পথে পথে টায়ার জ্বালিয়ে দেব। সবাই সাবধান। ওরা গুলি করতে পারে। জীবন বাঁচাতে হবে। কারো জন্যে অপেক্ষা করবে না। বাঁচতে হবে।

টায়ার নিয়ে বের হলো সাজ্জাদসহ আরও কয়েকজন। আব্দুস সাত্তারের চোখ তখনো বাইরে। অন্ধকার কিছুটা পাতলা হয়েছে। আকাশটা আবার ডেকে উঠছে। চারজন লোক ভারি কিছু নিয়ে হঠাৎ রাস্তার মাঝে দাঁড়াল। দেখাচ্ছে দানবের মতো। কালো কিছু একটা নামাচ্ছে। ট্রাকের টায়ার হবে। ওরা কারা? এখন মনে হচ্ছে প্রতিবাদ করবে। আগুন জ্বালাবে। জ্বালাক আগুন। জ্বালিয়ে দিক শহর। তারও মন চাচ্ছে নেমে পড়তে রাস্তায়। চোখ জানালায় লাগিয়ে বসে আছেন। দেখলেন টায়ারের ওপর কিছু ছিটিয়ে ওরা চলে গেল। আগুন জ্বালাল না। তখন আবার হতাশ হলেন। এক পশলা ঠান্ডা বাতাস ছুটে এল। শুনলেন বুটের শব্দ। আর্মিরা টহল দিচ্ছে। এগিয়ে আসছে তার জানালার দিকে।

অন্য সব পয়েন্টে টায়ার রেখে সাজ্জাদ দাঁড়াল রহমাত খাঁর সামনে। বলল আমাদের কাজ শেষ চাচা। এবার মিছিল নিয়ে বের হতে পারি।

শহরের কোথাও আর্মির গাড়ি দেখেছিস?

গাড়ি আছে। ওরা টহল দিচ্ছে।

আমরা একটা কৌশল করব সাজ্জাদ। মিছিল যেখান থেকে শুরু করব ওখানে কয়েকটা টায়ার জ্বালিয়ে দ্রুত অন্য রাস্তায় চলে যাব। ওরা বুঝতে পারবে না কোন পথে যাবে। পাগলা কুত্তা হয়ে ছুটবে। আমরা স্লোগান দেব। মানুষ যেন জানতে পারে মুজিব হত্যার প্রতিবাদে মিছিল করছি।

বিদ্রোহী দল মশাল নিয়ে হঠাৎ স্লোগান দিয়ে নেমে পড়ল শহরের রাস্তায়। যার সামনে রহমাত খাঁ। অন্ধকার সড়কগুলো হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠল। উত্তেজনায় ফেটে পড়ছেন তারা। স্লোগানের ওপর স্লোগান। মুজিবের রক্ত, বৃথা যেতে দেব না। মোশতাক গাদ্দার হে। জ্বালিয়ে দিল টায়ার। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে মিশে যাচ্ছে মেঘের শরীরে। রাতের শেষ ভাগে ঘুম ভেঙে গেল অনেকের। জানালায় দাঁড়ালেন তারা। উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে গেলেন আব্দুস সাত্তার। তার মুখে হাসি। এই তো শুরু হয়েছে প্রতিবাদ। দেখলেন তার বাড়ির সামনে জ্বলছে মশাল। সেই টায়ারে ধরিয়ে দিল আগুন। মুহূর্তে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গেল সব। কুণ্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়া আসছে তার বাড়ির দিকে। কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। শুনছেন বুটের শব্দ। ঠা ঠা গুলি। মিলিটারিরা ছুটে চলছে। মিছিলটা চলে গেছে অন্য রাস্তায়।

এবার কামানের গোলা ছুড়ল ওরা। কেঁপে উঠল শহর। আগুন লেগে গেল হামেদের রিকশার গ্যারেজে। দাউ দাউ করে জ্বলছে। সেখানে যারা ঘুমিয়েছিল তারা আর্তনাদ করছে, বাঁচাও বাঁচাও। তখনও মিছিল দিচ্ছেন রহমতা খাঁ। আগুন জ্বালিয়ে চলছেন। সবার কানে পৌঁছে গেছে প্রতিবাদের স্লোগান। ওরা পাগলা কুত্তা হয়ে ছুটছে। এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ছে। কামানের আরও কয়েকটা গোলা ছুড়ল। অবাক হয়ে গেলেন অফিসার। এই রাতে কারা নামল হঠাৎ মিছিল নিয়ে। মিছিলটা ঘুরে আসতেই ওরা আবার গুলি ছুড়ল। সাজ্জাদসহ কয়েকজন লাফিয়ে পড়ল জলে টইটুম্বুর পুকুরটায়। তীরে এসে মাথা গুঁজে চুপচাপ বসে রইল। আর একটা গ্রুপ চলে এসেছে ঘুরে সাত্তারের বাড়ির সামনে। সেখানে টায়ার জ্বলছে। আর্মির গাড়ি আসছে এদিকে। দৌড় শুরু করল তারা। গফুর পড়ে গেল। রহমাত খাঁ ধরে তুললেন। ঘুরে ডানদিকে গিয়ে আবদুস সাত্তারের বাড়ির পেছনে দেয়ালের পাশে আশ্রয় নিলেন। ওরা ভাবছে বাড়ির ভেতরে ঢুকেছে। বাড়ির ওপর গুলি করছে। সতিসের খবর নেই। সে মরার মতো পড়ে রয়েছে চা দোকানের পেছনে। হঠাৎ ভেতর থেকে ভেসে এলো আব্দুস সাত্তারের আর্তনাদ। ভাগো তোমরা। ভাগো। রহমাত খাঁর কানে এল সে শব্দ।

গুলি কিছুটা থামল। আর্মির গাড়ি চলে গেছে অন্যদিকে। ওরা অস্থির হয়ে ছুটছে। কারা মিছিল করল? সকাল থেকে রাস্তাঘাট ফাঁকা ছিল। একটা মানুষও ঘর থেকে বের হয়নি। দরজা জানালা খোলেনি। এত গুলি নষ্ট করেও ধরতে পারল না। হাওয়ায় মিলে গেল। কোথায় গেল।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সতিস। গলি দিয়ে এল আব্দুস সাত্তারের বাড়ির পেছনে। সতিসকে জড়িয়ে ধরলেন রহমাত খাঁ। ফিরছিস। ভয় পেয়ে গেছিলাম। সবাইকে নিয়ে গেলেন শঙ্করবাবুর বাসায়। বিমানবন্দর রোডে। এলাকাটা বেশ নিরিবিলি। এখানে অবস্থান নিবেন। আবার প্রতিবাদ হবে। দেখলেন তাদের দলের সবাই নাই। চিন্তায় পড়ে গেলেন।

হয়ত আছে কোথাও। কেউ আহত কিংবা নিহত হয়নি। বলল গফুর।

রহমাত খাঁ কিছুটা চিন্তামুক্ত হলেন। বললেন, ওরা বুঝুক প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। চলবে প্রতিবাদ। সবাই চুপচাপ বসে থাক। সকালে বের হব আমি। দেখব শহরের পরিস্থিতি। তারপর নতুন পরিকল্পনা করব।

ওরা যদি আপনাকে চিনে ফেলে কাকা? বলল সতিস।

চিনবে না। শহরে আমাদের লোক আছে। আশ্রয় নিতে পারব। শুনলি না ওই বাড়ির ভেতর থেকে একজন বললেন, ভাগো তোমরা, ভাগো। ওই বাড়িতে যাব। দেখব লোকটা কে!

৪

সকালটা খুব নিস্তব্ধ। রাস্তায় বের হয়নি মানুষ। আচমকা রাতের শেষভাগে প্রতিবাদী মশাল মিছিলের কারণে সতর্ক হলো সেনাবাহিনী। টহল দিচ্ছে গাড়ি। অনেকটা ছদ্মবেশে বের হলেন রহমাত খাঁ। রাস্তার দুপাশের বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ। তিনি হাঁটছেন। খানিক সামনে এলেন। দাঁড়ালেন গলির মুখে। হামেদের রিকশার গ্যারেজটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তখনও বের হচ্ছে ধোঁয়া। পোড়া রিকাশার ভস্মর ওপর পড়ে আছে একজনের পোড়া কঙ্কাল। সেনাদের গাড়ি এল তখন। মন্দিরের দেয়ালের পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালেন। আবহাওয়া বেশ ক্ষ্যাপাটে। ক্ষেতের ওপর দিয়ে বয়ে আসছে বাউলা বাতাস। মন্দিরের পাশে ফুল গাছ। লাল রঙের একটা ফুল দুলছে বাতাসে। খানিক সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। অস্থির মনও থেমে গেল সৌন্দর্যের সামনে।

সেনাবাহিনীর গাড়ি চলে গেল। বের হলেন রহমাত খাঁ। চলে এলেন শহরে। আব্দুস সাত্তারের বাড়ির সামনে। দরজাটা বন্ধ। কড়া নাড়লেন। কেউ খুলছে না। কার বাড়ি এটা। কেন তাদের বললেন, ভাগো তোমরা, ভাগো। আবার নক করলেন। দোতলা থেকে নেমে এলেন আব্দুস সাত্তার। গেট খুলে দিলেন। সালাম দিলেন রহমাত খাঁ।

উত্তর দিয়ে আব্দুস সাত্তার বললেন, আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

আমি রহমাত খাঁ। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

আতঙ্কিত মুখে বললেন, আসুন।

রহমাত খাঁকে নিয়ে দ্রুত দোতলায় উঠে গেলেন আব্দুস সাত্তার। বসলেন মুখোমুখি। জানতে চাইলেন কেন এসেছেন? শহরের অবস্থা ভালো না। মানুষ বের হচ্ছে না। আপনি কোথা থেকে এলেন? কীভাবে এলেন? চোখে পড়েননি আর্মির? ওরা দেখেনি তো এখানে এসেছেন? আতঙ্কিত হবেন না। ভয় নাই। আচ্ছা বলেন তো, ভোর রাতের দিকে এই বাড়ি থেকে একটা শব্দ দেয়াল ভেদ করে বের হলো, ভাগো, ভাগো তোমরা। শব্দটা কে করছিল? আপনি!

আপনি কীভাবে শুনলেন?

শহরে প্রতিবাদের ওই আগুন আমিই জ্বালিয়েছিলাম। সহ্য করতে পারিনি। মুজিব ভাইকে মেরে ফেলেছে ওরা। ওই মোশতাক গাদ্দার আর সেনাবাহিনী মিলে।

দাঁড়িয়ে গেলেন আব্দুস সাত্তার। বুকে জড়িয়ে ধরলেন রহমাত খাঁকে। আটকে রাখতে পারলেন না চোখের জল। ডুকড়ে কেঁদে উঠলেন। বললেন, মুজিব ভাই। এরপর কিছু বলতে পারলেন না। অনেকক্ষণ বুকে জড়িয়ে রাখলেন রহমাত খাঁকে। তারপর ছেড়ে বসলেন। বললেন, কাল রাতে আমার চোখে ঘুম ছিল না। জানালায় চোখ দিয়ে বসেছিলাম। খুব কষ্ট হচ্ছিল। মুজিব ভাই নাই। ভাবতেই পারছিলাম না। তার থেকেও বেশি কষ্ট হচ্ছিল একটা মানুষও নামল না প্রতিবাদ করতে। সে কষ্ট দূর হলো রাতের শেষভাগে। ওরা গুলি করছিল মিছিলে। কিছু বুঝতে পারলাম না। আমার মুখ থেকে হঠাৎ ওই শব্দটা বেরিয়ে গেল। ওরা গুলি করেছিল আমার বাড়ির ওপরও।

রহমাত খাঁ বললেন, প্রতিবাদ চলবে। থামব না আমি। কোনো ভয় থামাতে পারবে না। জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে প্রতিবাদ করব। বদলা নেব মুজিব হত্যার। আগুন জ্বলবে। কেউ থামাতে পারবে না। আগুন আমার বুকেও জ্বলছে।

আব্দুস সাত্তার বললেন, প্রতিবাদ রাতে নয়। হবে দিনে। শহরে আজ মিছিল করব। মুজিব হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে।

তাই! আপনি নামবেন?

হ্যাঁ। আমি নামব। সহ্য করতে পারছি না। কাল থেকে যন্ত্রণায় ছটফট করছি। ঘুম নাই চোখে। খাবার তুলতে পারিনি মুখে। আজ দুপুরে মিছিল বের করব। যেন ঘর থেকে সবাই বেরিয়ে আসে। স্লোগানে কাঁপিয়ে তোলে পথঘাট।

রহমাত খাঁর উত্তেজনা বেড়ে গেল। মিছিল দিনেই হবে। উঠলেন তিনি। বললেন লোক জড়ো করি আমি। আব্দুস সাত্তার বললেন আমিও যাব আপনার সঙ্গে। মানুষ আন্দোলন করতে চায়। কিন্তু ভয় পায়। সাহস পেলে ওরা নেমে আসবে। জানি, আন্দোলন করলে ফিরে আসবেন না মুজিব ভাই। আমাদের অস্থিরতা দূর হবে। একটু শান্তি পাব।

আব্দুস সাত্তারকে নিয়ে রহমাত খাঁ এলেন শঙ্করবাবুর বাসায়। দরজায় নক করতেই ভেতরে দেখা দিল আতঙ্ক। কেউ খুলতে চায় না। সতিস বলল, রহমাত কাকা আসছেন মনে হয়। খুলে দেখল হ্যাঁ, রহমাত কাকা। সাথে আরও একজন। তাকে চিনে না। রহমাত খাঁ বললেন, আমরা মিছিল বের করব। রাতের আধারে লুকিয়ে না গফুর। প্রতিবাদ হবে দিনের আলোতে। ভয়ের কিছু নেই। শহরের যেসব বাড়ির দরজা বন্ধ, মিছিলের সময় তা খুলে যাবে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে মানুষ। মিশে যাবে মিছিলের স্রোতে। আমাদের সঙ্গে প্রতিবাদে নামবেন সাত্তার ভাই।

সবাইকে নিয়ে বিমানবন্দর সড়ক দিয়ে গোপনে ট্রাকস্টান্ড গেলেন রহমাত খাঁ। আব্দুস সাত্তার গেলেন জুট মিলে। শহরের অবস্থা ক্রমশ গরম হচ্ছে। আর্মি অফিসারদের মাথা গরম। তারা চাচ্ছেন একজন মানুষও যেন রাস্তায় না নামে। কেউ যেন মুখ না খোলে।

সতর্ক অবস্থার মধ্যেও প্রতিবাদের মিছিল হয়েছে শহরে। জ্বলেছে আগুন। তাদের নাকের ডগা দিয়ে পালিয়ে গেছে ওরা।

ট্রাকস্টান্ড গিয়ে রহমাত খাঁ দেখলেন অন্য চিত্র। ট্রাকের ড্রাইভার হেলপার বসে আছে। কথা বলছে মুজিবকে নিয়ে। তাদের ভেতরও রয়েছে ক্ষোভ। মানুষটা কী অপরাধ করলেন। পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলেছে। রহমাত খাঁ বসলেন তাদের নিয়ে। আবেগ জড়ানো কণ্ঠে কিছু কথা বললেন। এরপর বললেন শেখ মুজিব হত্যার প্রতিবাদ করব আমরা। তারা রাজি হলো। নামবে পথে। মিছিল দিবে। প্রতিবাদ করবে। শেখ মুজিবের জন্য জীবনও দিতে পারে।

আব্দুস সাত্তার গেলেন জুট মিলে। শ্রমিকদের নিয়ে মিছিল বের করবেন। তারাও রাজি। শেখ মুজিবের জন্য বহু মিছিল দিয়েছে। তার হত্যার প্রতিবাদে আবারও জ্বলে উঠল। কালই নামত মাঠে। কার ডাকে নামবে। সাহস পায়নি।

শহরের দুই প্রান্ত থেকে বের হবে মিছিল। বিক্ষোভ মিছিলের সামনে দাঁড়াতে পারবে না কেউ। স্রোতের মতো নেমে আসবে মানুষ। বিদ্রোহ করবে রহমাত খাঁ। ট্রাকস্টান্ড থেকে শখানেক মানুষ নিয়ে বের হলেন। সবার হাতে বাঁশের লাঠি। স্লোগান মুখে, মুজিবের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। জ্বালো জ্বালো, আগুন জ্বালো। মোশতাক গাদ্দার হে। এগিয়ে যাচ্ছে মিছিল। চেতনা ফিরল ভয়ে জবুথবু হয়ে থাকা ঘরবন্দি মানুষের। প্রতিবাদী হয়ে উঠলেন তারা। একের পর এক খুলে যাচ্ছে দরজা। বেরিয়ে আসছে মানুষ। ফেটে পড়ছে উত্তেজনায়।

মিছিলের শব্দ শুনে মাতাল হয়ে ছুটে এল আর্মির গাড়ি। নেমে পড়ল অস্ত্র হাতে। প্রথমে করল ফাঁকা গুলি। ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার চেষ্টা। কিন্তু যাচ্ছে না মানুষ। তীব্র উত্তেজনায় স্রোতের মতো এগিয়ে আসছে। মিছিলের সামনে রহমাত খাঁ। বলিষ্ঠ কণ্ঠে তার, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। হঠাৎ গুলির শব্দ। পড়ে গেলেন তিনি। গুলি লাগছে পায়ে। অন্যরা পিছু হটল। কেউ কেউ ঢুকে পড়ল ঘরে। ছুটে গেল ট্রাকস্টান্ডের দিকে। রহমাত খাঁ উঠতে পারলেন না। তাকে ধরে ফেলল আর্মিরা। চিৎ করে শোয়াল। বুকের ওপর রাখল বুটপরা পা। চোখের সামনে বন্দুকের নল। অগ্নিদৃষ্টি অফিসারের। কীসের প্রতিবাদ মিছিল দিচ্ছিস? জানিস না কারফিউ। ঘর থেকে বের হওয়া নিষেধ।

শরীরের সবটুকু শক্তি গলায় এনে রহমাত খাঁ বললেন, মুজিব হত্যার প্রতিবাদ। মোশতাক গাদ্দার হে। তোমরা হাত মিলিয়েছ ওদের সঙ্গে।

পাশ থেকে একজন বুট দিয়ে আঘাত করল রহমাত খাঁর বুকে। প্রতিবাদ করাচ্ছি। আবার একটা দিল। রহমাত খাঁ হাসলেন। আবার মারল। মারতে থাকল অনেকক্ষণ। জ্ঞান নেই রহমাত খাঁর। টানতে টানতে নিয়ে এল শহরের মাঝে। অফিসার বললেন, এমন শিক্ষা দেব কেউ রাস্তায় নামার সাহস দেখাবে না। দড়ি নিয়ে আসতে বললেন একজনকে।

একজন সৈনিক দৌড়ে গেল দড়ি আনতে। শহরে ছড়িয়ে পড়ল নতুন আতঙ্ক। নীরবতা নামল পিনপতন। তবে উত্তেজনায় ফুটছে মানুষ। সতিস ভেঙে পড়ছে কান্নায়। সাজ্জাদ বলল, রহমাত কাকাকে ছিনিয়ে আনব। ওভাবে মরতে দিতে পারি না।

গফুর থামাল। রহমাত কাকা নিষেধ করছেন। বলছেন, তোদের বেঁচে থাকা খুব দরকার। এ প্রতিবাদ শেষ হবে না। আমি না থাকলেও চালিয়ে যাবি তোরা।

সাজ্জাদ পা থামালেও চোখে জল। বসে পড়ল মাথায় হাত দিয়ে।

রশি নিয়ে এল সেই সৈনিক। অফিসার বললেন, আম গাছে উঠতে। একজন উঠে পড়ল দড়ি নিয়ে। নিচ থেকে দড়ির অন্য মথায় বেঁধে দিল রহমাত খাঁর পা। টেনে তুলল গাছে থাকা সৈনিক। ঝুলছেন রহমাত খাঁ। তখনো জ্ঞান ফেরেনি। পাগলের মতো পিটাচ্ছে ওরা। উল্লাস করছে। সফলতার উল্লাস। প্রতিরোধ করতে পেরেছে বিদ্রোহ। জানতে চাইল, কাল রাতে কে মিছিল নিয়ে নামছিল শহরে?

রহামত খাঁ বলে উঠলেন, মোশতাক গাদ্দার হে। তোরা সবাই গাদ্দার। প্রতিবাদ চলবে। বন্ধ হবে না।

অফিসার ক্ষেপে গেলেন। বেদম পিটিয়ে যাচ্ছেন। সব ভয় দূরে রেখে এই দৃশ্য দেখার জন্য জড়ো হলো কিছু মানুষ। অনেকে কাঁদছে নিঃশব্দে। খানিক দূরে পড়েছিল একটা টায়ার। কাল রাতে ফেলে রেখেছিল সাজ্জাদ। এ পথে আসতে পারেনি। তাই হয়নি ওটার মুখাগ্নি। সেটা টেনে আনতে বলল অফিসার। কয়েকজন সৈনিক সেটা নিয়ে এল। রাখল রহমাত খাঁর মাথার নিচে। অফিসার বলে যাচ্ছেন, কারা মিছিল বের করেছিল? কীসের প্রতিবাদ?

মুজিব হত্যার প্রতিবাদ। মুজিবের রক্ত বৃথা যেতে দেব না।

অফিসারের রাগ মাথায় চড়ল। মুজিব হত্যার প্রতিবাদ। মুজিবই নাই। তার আবার প্রতিবাদ। করাচ্ছি প্রতিবাদ। দিলেন টায়ারে আগুন ধরিয়ে। কালো ধোঁয়া মুহূর্তেই গিলে ফেলল রহমাত খাঁর শরীর। ক্রমশ তা কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। সেই ধোঁয়ার ভেতর থেকে ভেসে আসছে একটা শব্দ, মুজিবের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। মোশতাক গাদ্দার হে।

দূরে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য যারা দেখছিলেন তারা কেঁদে উঠলেন শব্দ করে। হা হা করে হেসে উঠলেন অফিসার। থেমে গেল প্রতিবাদ। রাস্তায় নামার সাহস দেখাবে না কেউ। তখনই শহরের অন্য মাথা থেকে বিশাল মিছিল নিয়ে এলেন আব্দুস সাত্তার। বাতাসের সাথে ভেসে আসছে জয় বাংলা। মুজিবের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। মোশতাক গাদ্দার হে। অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন অফিসার। তখনই ঝুম করে নেমে পড়ল বৃষ্টি।

দেখা হবে ফের

নাসির আহমেদ

বৈশাখি মেঘ ঢেকেছে আকাশ
বাতাসে বৃষ্টিগন্ধ
চৈত্রের ধুলো উড়ছে তখনো চেতনার প্রান্তরে
আমার কি হবে হালখাতা এইবারও?
মনে জ্বলে এই দ্বন্দ্ব!

যে-পথ এসেছি পিছু ফেলে একদিন
বৈশাখি মেঘ সে পথে এখনো অশ্রু ঝরায়!
ভাবতেই বুকে জ্বলে ওঠে ফের পুরনো আগুন,
ভারি হয়ে ওঠে বিরহের ঋণ।

একুশ বছর পর
শান্ত দুপুরে মুখোমুখি হলে
দুজন মানব-মানবী
আমাদের বুকে বইছিল ঝড়।
সে ঝড়ে ভাঙেনি সংসার আমাদের।

চৈত্র বলেছে– শোনো বৈশাখ!
অশ্রুর খেয়া বেয়ে বার বার
মুখোমুখি হবো, দেখা হবে ফের
পৃথিবী ঘূর্ণায়মান ...

এ মধুরও ভুল

কনক চৌধুরী

ঘরে অনেক কালের ধূলি জমেছে
কাজের তাগিদে আর পরিষ্কার করা হয়ে ওঠেনি
হাতের খুব কাছের ছবিটির ওপর এত ধূলি জমেছে যে
তাকে আর চেনা যায় না।
হাতে নিয়ে ঝেড়ে দেখি ছবিটা সাদাকালো,
রং বুঝি ঝরে গেছে।

মনকে প্রবোধ দিলাম–
সাদাকালোই খাঁটি, আদি, অকৃত্রিম
যেমন সরাসরি 'হ্যাঁ' বা 'না' বলার মতন
যার মাঝে নেই কোনো অনিশ্চয়তা, নেই শর্ত,
নেই অপেক্ষার পালা, নেই প্রতারিতের সম্ভাবনা
আর নেই নির্ভরতার ঘাটতি।

ছবিটা একদিন রঙিন ছিল
থাক না আজ সাদাকালো হয়ে।
স্বপ্ন তো সাদাকালোই হয়।

ভাঙিও না ভাঙিও না এ মধুরও ঘুম
ভাঙিও না ভাঙিও না এ মধুরও ভুল।

আমি

সিরাজউদ্দিন আহমেদ

আমার সামনে দাঁড়িয়ে এক দীপ্ত পুরুষ
উন্নত শির বাহুতে তাঁর স্বর্ণ খচিত রাজকীয় চিহ্ন
তাচ্ছিল্য স্বরে শুধালো সে, কে তুই?
ভাবখানা যেন মহাবীর নিধিরাম সর্দার।

আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমণ করে
ভারতের বড়ো রাজ্যের সব রাজারা বিনা যুদ্ধে
নত শিরে সবাই তার বশ্যতা স্বীকার করে,
উল্লাসে জয়ধ্বনি দেয় মহাবীর আলেকজান্ডার দীর্ঘজীবী হোন।
আমি তখন পাঞ্জাবের ছোটো এক রাজ্যের রাজা পুরু
একাই দাঁড়িয়ে ছিলাম স্বাধীনতার পতাকা হাতে,
আমি পরাজিত শৃঙ্খলিত তবু নত করিনি শির
পররাজ্য গ্রাসী দখলদার আলেকজান্ডারের পদতলে।
স্বাধীনতার জন্য আমার ত্যাগ স্বমহিমায় গৌরবে
উড়বে একদিন
ইতিহাস বলবে আমার দেশপ্রেম গর্বিত অহংকারে।

আমি মঙ্গল পান্ডে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের
প্রথম স্ফুলিঙ্গ
আমি তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার স্বাধীন পতাকা
আমি ক্ষুদিরাম, স্বাধীনতার জন্য হাসি মুখে দেই প্রাণ
আমি প্রীতিলতা, স্বাধীনতার বেদিতে আছে আমার
রক্ত কয়েক ফোঁটা
আমি আজাদ জুয়েল রুমি শত্রুর বুকে গেরিলার
শাণিত অস্ত্র
আমি বাংলার স্বাধীনতা রবি ঠাকুরের অমর প্রেমের গান
আমি বিদ্রোহী চির উন্নত শির আমি শেখ মুজিবুর রহমান।

রোজা

নুরুল ইসলাম বাবুল

সেহরি খেয়েই রোজাদার রাখে রোজা
সারাবেলা তার সংযমে দিন কাটে,
মুমিন লোকের কাছেতে বড়োই সোজা
খাস রোজাদার স্বর্গের পথে হাঁটে।

রোজা মানে নয় শুধুই উপোস থাকা
কিছু কিছু তার নিয়মকানুন আছে,
অন্যায় থেকে নিজেকে বিরত রাখা
নত হয়ে যাও মালিক প্রভুর কাছে।

সেই রোজাদার স্রষ্টার কাছে প্রিয়
যার মন থাকে একাগ্রতায় ভরা
অভুক্তদের কষ্টটা জেনে নিও
তোমার রোজায় পুণ্যে ভরবে ধরা।

আমি যখন সুবর্ণ জয়ন্তীর কথা বলি

মিলন সব্যসাচী

আমি যখন সুবর্ণ জয়ন্তীর কথা বলি তুমি তখন–
ধীর পদক্ষেপে উঠে এসে দাঁড়াও জনতার মঞ্চে
তোমার ঊর্ধ্বে তোলা অঙুলির ঐতিহাসিক আগুন
পরাজিত অন্ধকারের বুক চিরে সকালের সোনারোদে
ভরে দেয় দুখিনি মায়ের নিকোনো উঠোনের স্বপ্নিল প্রান্ত
দূর দিগন্তের সুবর্ণরেখার উন্নতশিরে উদ্ভাসিত হয় রক্তিম।

আমি যখন সুবর্ণ জয়ন্তীর কথা বলি তুমি তখন-
তীর্থভূমি টুঙ্গিপাড়া থেকে বাড়াও স্নেহসিক্ত হাত
তোমার অবিনাশী ভালোবাসায় ভরে যায় স্বপ্নের আঙিনা
অবারিত সবুজের মাঠে দুলে ওঠে বাউল বাতাস
মধুমতীর শান্ত বুকে বালিহাঁসগুলো করে কোলাহল
অনাবিল আনন্দে আবার প্রশস্ত হয় অসীম আকাশ।

আমি যখন সুবর্ণ জয়ন্তীর কথা বলি তুমি তখন–
লৌহদগ্ধ কারাগারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর পেরিয়ে একনিমিষে
ছুটে এসে অনড় হিমালয়ের দৃঢ়তায় থমকে দাঁড়াও
মুক্তিকামী মানুষের নন্দিত নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর মুখোমুখি
মার্কস, লেনিন, মার্শাল টিটু, মাও সেতুং সম্মিলিত সুর সাধে
বিশ্বখ্যাত বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের অগ্নিবীণা।

আমি যখন সুবর্ণ জয়ন্তীর কথা বলি তুমি তখন–
'জয় বাংলার' মন্ত্রমুগ্ধ সুরে শোনাও রাজনীতির মহাকাব্য
ঝিমিয়ে পড়া জীবন যুক্ত হয়ে দীর্ঘ হয় মৃত্যুর মিছিল
রক্তের প্লাবনে ভেসে যায় সবুজে সজ্জিত স্বদেশ স্বর্গ
অশ্রু সরোবরে ফোটে নীলপদ্ম আর রক্তিম শতদল
পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তুরাগ, তিতাস কাঁদে অন্তমুখী তরঙ্গে।

আমি যখন সুবর্ণ জয়ন্তীর কথা বলি তুমি তখন–
অব্যক্ত অভিমানে মলিন মুখে ঘুমিয়ে পড় রক্তাক্ত সিঁড়িতে
পাঁজর ভাঙা দীর্ঘশ্বাসে শোকার্ত কান্নায় নুয়ে পড়ে স্বদেশ
শান্তির-শ্বেত পায়রাগুলো দিকহারা পথিকের মতো
খুঁজে ফিরে তোমার চেতনায় দীপ্ত শিখায় আলোকিত মানচিত্র
তবু দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে গর্বিত।

আকাঙ্ক্ষা

দেবকী মল্লিক

পর্ণ কুটিরে জনম আমার
সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত,
চাই না আমি সুখের বাসর
সবুজে রই যেন নিদ্রিত।
মাথার 'পরে উদার আকাশ
ঠাঁই যে দিয়েছে মাটি,
সেই-তো মোর আসল ঠিকানা
সোনার চেয়েও খাঁটি ॥

শত গোলাপ ফোঁটার দিন

আনসার আনন্দ

চৈতালি বসন্ত বাতাসে
মধুমতীর তীরে সবুজে-শ্যামলে
আনন্দ আনন্দ ঢেউ খেলে যায়
ডাহুক ডাকে সন্ধ্যা নামে
নতুন অতিথির আগমনী সুর বাজে
আজ ১৭ই মার্চ খোকা আসবে
শত গোলাপ ফোঁটার দিন
খোকা আসবে। যেন মহানায়ক
উজ্জ্বল নক্ষত্র আলোক পথে
হেঁটে হেঁটে এই বাংলায়।
বঙ্গবন্ধু তুমি বাংলার পথে-প্রান্তরে
সংগ্রাম আন্দোলনের দুর্বার ইতিহাস
বঙ্গবন্ধু তুমি বঙ্গোপসাগর
উথাল-পাথাল ঢেউ।
রেসকোর্স ময়দান ৭ই মার্চ
তোমার তর্জনী আকাশ ফুঁড়ে ওঠে
লক্ষ শহিদের রক্তনদী পার হয়ে
এল স্বপ্নের বিজয়। ১৬ই ডিসেম্বর
এক ঝাঁক শ্বেত কপোত ওড়ার দিন।
তারপর পনেরো আগস্ট নীল অন্ধকার
বেদনাবিধুর সব হারিয়ে যাওয়া ....
তোমার স্বপ্নচোখ সোনার বাংলা
যেন লাল-সবুজের ঘুড়ি হয়ে ওড়ে
বাংলার আকাশে-বাতাসে হৃদয়ে হৃদয়ে।

ভালোবাসি

ছাদির হুসাইন ছাদি

ভালোবাসি মা-মাটি আর
ভালোবাসি দেশ,
ভালোবাসি লাল-সবুজের
রঙিন পরিবেশ।
ভালোবাসি ফুল-পাখি আর
ভালোবাসি চাঁদ,
ভালোবাসি লাল-সবুজের
শক্তিশালী বাঁধ।
ভালোবাসি নদনদী আর
ভালোবাসি জল,
ভালোবাসি লাল-সবুজের
মধুর চলাচল।

বাঙালির সত্তা

আমিরুল হক

পহেলা বৈশাখ
বাঙালির ঘরে আলোময়
নতুন একটি দিন।
লুকানো থাকে কত আশা
কত স্বপ্ন তাতে।
সোনালি অন্তরে তাই
ছায়া ফেলে বারবার।
ফেলে আসা দিন আর বছরের হিসাব
মিলাতে অপেক্ষমান দীনবন্ধু হয়ত
ব্যস্ত কলম হাতে।
রহিম শেখের হালখাতায় মিষ্টিমুখে
নতুন কালিতে লেখা হবে
অঙ্কের হিসাব।
গাঁয়ের বটতলায় জমে ওঠা
বৈশাখি মেলায়
হরেকরকম বাহারের উৎসবমুখর পরিবেশে
স্বদেশের গন্ধ ছড়ায়।
নোলক পরা গ্রাম্য বধূর আতিথেয়তায়
জড়িয়ে রয়েছে নির্মল বাঙালির সত্তা।

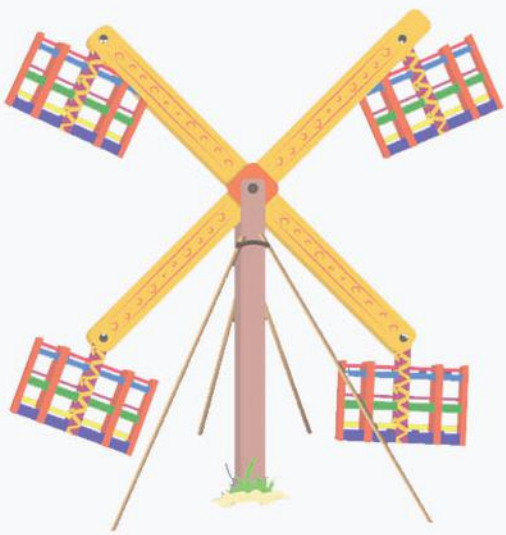

বৈশাখি ছড়া

আপন চৌধুরী

আম পাকে জাম পাকে
আরো পাকে লিচু।
বাঁদুড় খেয়েছে কাঁঠাল,
গাছে আরো আছে জ্যৈষ্ঠমধু।
ডাবের পানি খেতে তবে
লাগে বড়ো ঠান্ডা।
কোকিল পক্ষি ডিম পেড়েছে
ফুটছে তবে আন্ডা।
তেঁতুলের দিন শেষে মেয়েদের,
মন লেগেছে আমের ঝোলে।
ঢাকঢোল বাজে শুধু
চারদিকে মহা ধুমধামে।
বর চলেছে শ্বশুরবাড়ি
মুখে রুমাল দিয়ে।

বৈশাখের পঙ্‌ক্তিমালা

মঈনুল হক চৌধুরী

সোনালি ভোরের রুপালি আলোয়
এল বৈশাখ–
বৈশাখ এলেই কেন জানি
সাজ সাজ রব ওঠে প্রকৃতিতে।
গাছে গাছে নতুন পাতা
দোল খায় ঝড়ো হাওয়াতে,
ফুল ফোটে বনে বনে
গাছের ডালে বসে পাখি গায় গান
আনন্দে মনটা কেমন নেচে ওঠে
এমনি করেই বৈশাখ আসে।
আকাশজুড়ে চাঁদ ওঠে
আকাশের খইফোটা তারাগুলো
নেভে আর জ্বলে-
ভাবুক কবি লেখেন কবিতা
শিল্পী আঁকেন ছবি
বাউল দোতারা হাতে গায় গান,
জীর্ণ পাতায় আসে সবুজের হাসি
জল হারানো নদীর বুকে নামে জোয়ারের ঢল
বৈশাখ ডাক দেয় ঘুম থেকে ওঠার,
বৈশাখ মানেইতো
নতুনকে জড়ানো নতুনের পোশাকে।
বৈশাখ আসা মানেই
একটি নতুন বছরের শুরু
নতুন দিনের জয়গান–
আর
আগামী দিনের স্বপ্ন চোখে মেখে
বুকে আশা বেধে বেঁচে থাকে মানুষ।

নতুন দিন

মিজানুর রহমান মিথুন

নতুন বছর এল নতুনের গানে,
আনন্দ যায় ছুঁয়ে কোটি প্রাণে প্রাণে,
নতুনের আহ্বানে জেগেছে দেশ,
খুশিতে মন ভরে আহা বেশ বেশ।
পুরনো পিছু ফেলে নতুনের দিনে,
সত্য ও সুন্দর নিই সবে চিনে।
চিনে নিই নিজেকে, চিনে নিই দেশ,
জেনে নিই কীভাবে গড়ব স্বদেশ।
সুন্দর মানুষ হয়ে বিশ্বের বুকে,
বছরের প্রতিদিন কাটাবোই সুখে।

বৈশাখ

শিরিন আক্তার

বৈশাখ মানে ঝড়ো হাওয়া
– কালবৈশাখি ঝড়!
বৈশাখ মানে ঘুটঘুটে কালো অন্ধকার হয়ে
ধেয়ে আসে মেঘ,
গর্জে ওঠা আকাশ আর ঝড়ো হাওয়া–
উড়িয়ে নিয়ে যায় আবুলের ঘরের চাল।
তবুও-তবুও বৈশাখে কী যে আনন্দ লুক্কায়িত!
নতুন বছরে, নতুন দিনের আশা–
সোনালি সূর্য, বাদলা দিনে–
টক মিষ্টি কুড়িয়ে পাওয়া আম
কী যে ভালোলাগা, ভালোবাসা!
পুরাতন জীর্ণতা অবসান ঘটিয়ে
নতুন আলোর প্রত্যাশায় বুক বাঁধে বাংলার মানুষ।
পান্তা, ইলিশ, মরিচ পোড়া ও ভর্তা
এ যেন এক মহা উৎসব!
বৈশাখ মেলা– মুড়িমুড়কি, খৈ,
চিনির সাজ, গুড়ের ঢেলা আর তিলের গজা
বাংলার রূপ-প্রকৃতি দেখে বিশ্ববাসী!
বাংলার এ আনন্দে উৎসব মাত্রা আরও–
আরও বাড়িয়ে দিয়েছে–
নতুন উদ্দীপনায় উৎসব ভাতা,
বাংলায় এ যেন এক নতুন মাত্রা।
জয়তু বঙ্গবন্ধুকন্যা!
জয়তু বাংলাদেশ!!

বোশেখের আগমন

ফরিদ আহমেদ হৃদয়

চারদিকে ঢোল বাজে
টাক্ ডুমা ডুম
আজ যেন খুশিতেই
নাই কারো ঘুম।
বুঝে গেছি আজ কেন
এত বেশি হর্ষ
এক সাল পার হয়ে
এল নববর্ষ।
বোশেখের আগমনে
হালখাতা শুরু
ঝড় হবে ভয়ে কাঁপে
বুক দুরু দুরু।

বৈশাখি দিনে

প্রজীৎ ঘোষ

বাংলার প্রকৃতি আজ সেজেছে নতুন সাজে
এক অপ্রাপ্তির অতৃপ্ত তৃষা প্রেমময় সুধা মাটির মাঝে
পাতাঝরা বৃক্ষরা পেয়েছে বুঝি নতুন পাতার সজীবতা
তাই দেখে গাঙশালিকেরা বলে যায় মনের কথা।
এই মাটির বুকে শুকনো পাতা কান পেতে শোনে তার হাহাকার
মনে হয় বৈশাখি দিন বড়ো অমলিন, বেদনার
ঐ সবুজের চোখে চোখ রেখে দখিন হাওয়া দেখে তার সুখ
রাতে চৈতি চাঁদের আলোয় জুড়ায় তৃষিত পোড়া বুক।

এত সুখ এত আনন্দের মাঝে
হঠাৎ আকাশে যেন যুদ্ধের শঙ্খ বাজে
ঐ এল রাক্ষসী বৈশাখি
কৃষকের দুরু দুরু কেঁপে ওঠে প্রাণপাখি
কাঁচা মাটির ঘর, বাঁশের বেড়া
আকাশে কালো মেঘ ছেঁড়া ছেঁড়া
পাখিরা বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করে
বৃক্ষরা মাটির বুকেতে আঁছড়ে আঁছড়ে পড়ে।

সুখের স্বর্গ ভেঙে যায় অন্ধকারে নেমে আসে চিল
এ জীবন সংসার শুধু জ্বালাময় হয় না কখনো অন্ত্যমিল
তবু চোখ স্বপ্ন দ্যাখে মন আঁকে ছবি
অন্ধকার রাতের শেষে আলো জ্বেলে কখন হেসে ওঠে রবি!

প্রকৃতি

শহিদুল ইসলাম লিটন

বাংলার প্রকৃতির রং দেখতে আহা কি অপরূপ
সবুজ রং ধারণ করে রেখেছে তার স্বরূপ
প্রকৃতির বুকজুড়ে রয়েছে যে সবুজের বাহার
যত দেখি মিটে না যে আমার মনের আহার।

পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য আমার প্রকৃতির কাছে হয়ে যায় ম্লান
সৌন্দর্য সুষমায় পৃথিবীর বুকে তুমি আজও হয়ে আছ অম্লান
নদী-পাহাড়-পর্বত যতই না আছে তোমার বুকে
মনে হয় পরম মমতায় জুটি বেঁধে আছে মহা সুখে।

নদী যেমন ছুটে চলে সাগরের-ই পানে
পাখিরা উড়ে যায় ডানা মেলে গানে-গানে
তোমার বুকে যখন দেখি শাপলা ফুলের হাসি
রাখালের বাঁশির সুরে আমি তখন আনন্দতে ভাসি।

তোমার সুবাস নিতে দূর থেকে আসে যখন অতিথি পাখি
হৃদয়জুড়ে দেখে তখন আমার দুটি আঁখি
যেখানে থাকি না কেন আমি অতি মহাসুখে
তোমার স্মৃতির আলপনা যেন গাঁথা থাকে আমার বুকে।

তুমি এখন আকাশ হতে পারো

ইমরুল ইউসুফ

তুমি চাইলে এখন আকাশ হতে পারো
কিংবা হতে পারো মেঘ
মেঘে মেঘে ভেসে বেড়ানো জলপরি
মেঘে মেঘে ছুটে বেড়ানো বালুইহাঁস
মেঘে মেঘে হেঁটে বেড়ানো ধূলিপুঞ্জি।
তুমি চাইলে এখন আকাশ হতে পারো
কিংবা হতে পারো কনক প্রদীপের আলো
আলোয় আলোয় ছুঁয়ে থাকা রংধনু
আলোয় আলোয় মিশে থাকা রৌদ্রসুখ
আলোয় আলোয় ডুবে থাকা ধ্রুবজ্যোতি।
তুমি চাইলে এখন আকাশ হতে পারো
এখন আকাশ থেকে–
খুব সহজে নেমে আসে আলোর রশ্মিসখা
খুব সহজে ধেয়ে আসে বাতাসের বিশুদ্ধতা
কারণ করোনার বিষ গিলেছে বিমানের সম্ভ্রম।
তুমি চাইলে এখন আকাশ হতে পারো
কারণ মেঘেরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্লান্ত;
অবসন্ন মেঘমন্দিরের রাখাল বালক
শ্রান্ত নীলাম্বর মেঘের অবারিত ঢেউ
পাখির চোখে মুগ্ধতার ফেনিল সুখ
চোখবন্দি আকাশের এখন কোনো দুঃখ নেই
জলবন্দি মেঘের এখন কোনো কষ্ট নেই
চাইলে তুমি এখন আকাশ হতে পারো।

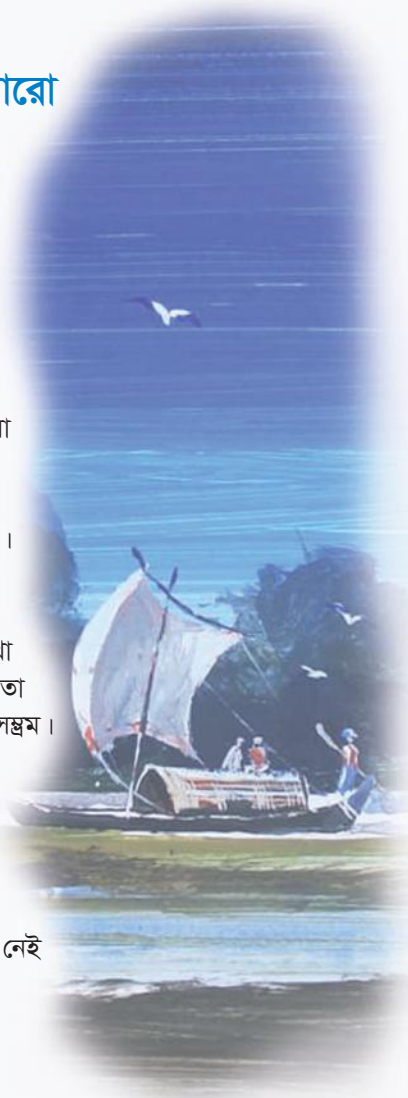

সাম্প্রতিক

ইজামুল হক

ভালোবাসা চাও?
কিংবা
চারপাশ নত হোক গভীর শ্রদ্ধায়
ছলাকলা শিখে নাও তবে।
যত পার তাল দাও
ভুলে যাও তুমিও মানুষ
কণ্ঠে মধু ঢালো
যত বেশি ক্ষতি নেই
ভেতরে গরল?
ওখানে পৌঁছার সাধ কজনার থাকে
পারেও কজন?

গোলাপ ফুলের রানি

মো. রুস্তম আলী

জবা, টগর, হাসনাহেনা
গাঁদা ছড়ায় সুবাস
দেখতে সুন্দর পলাশ।
জুঁই, চামেলি, দোপাটি,
শিউলি আর টিউলিপ
গলার মালা বেলি।
বকুল, চম্পা, শেফালি।
আমরা সবাই জানি
গোলাপ ফুলের রানি।

মানুষের মধ্যে মানুষ

আলী মামুদ

মতিহারে হয়েছিল দেখা– এইটুকু মনে পড়ে
কোনো কথা হয়েছিল কিনা মনে নেই,
এতদিন পরে দেখা
এতদিন আগেকার কথা নিয়ে
কী লাভ সময় ক্ষেপণের
বরং পারলে ভুলে যাওয়াই অবশ্য উচিত,
কত কিছুইতো ভুলে যেতে সক্ষম হই
মানুষের মধ্যে কোনো আরেক মানুষ কী থাকে?
সবকিছু অবিকল মনের মধ্যে ধরে রাখতে!

স্বপ্ন ভাঙিলে

মোসলেম উদ্দীন

মানুষের থাকে কিছু স্বপ্ন
ভাঙিলে সব সাধ শেষ
থাকে না কিছুই আর
ঝরে গেলে পাপড়ি
ভ্রমর কি আসে?
মর মর পাতার ধ্বনি
ভাসে শুধু বাতাসে;
কেবা থাকে কার পাশে
আশপাশে ঘেঁষে কয় না কথা
হয় না দিতে জবাবদিহি
একটু কথাও সরে না মুখে
কানেও আসে না কোনো স্বর মিহি;
তেমনি হয়েছে দশা
বুঝাতে নারি আর
তুমি আমি বলো
কেমনে হই এইবার পার !
অনেক কথাই হলো
এবার ষোলো আনা কড়ি ফেল
শেষ রক্ষাই আসল রক্ষা
পণ্ডিতে বলে গেল
বুঝে নিও প্রয়োজনে কখনো।

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

৭ই মার্চ বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের এ দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বজ্রকণ্ঠে যে কালজয়ী ভাষণ দিয়েছিলেন, তারমধ্যে নিহিত ছিল বাঙালির মুক্তির ডাক। সরকার এ দিনটিকে 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে– যা একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী ভাষণ উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, স্বাধীনতা বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন। তবে তা একদিনে অর্জিত হয়নি। মহান ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১-এর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের এই দীর্ঘ বন্ধুর পথে বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম সাহস, সীমাহীন ত্যাগ–তিতিক্ষা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সঠিক দিক নির্দেশনা জাতিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১লা মার্চ থেকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অসীম সাহসিকতার সাথে রেসকোর্স ময়দানে লাখো–জনতার উদ্দেশে যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন, তা ছিল মূলত বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। ঐতিহাসিক সেই ভাষণের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। এরপর দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ পৃথিবীর কালজয়ী ভাষণগুলোর অন্যতম উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর এই ভাষণকে 'Worlds Documentary Heritage'-এর মর্যাদা দিয়ে Memory of the World International Register-এ অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাঙালি হিসেবে এটি আমাদের বড়ো অর্জন। এ ভাষণের কারণে বিশ্বখ্যাত *নিউজউইক* ম্যাগাজিন ১৯৭১ সালের ৫ই এপ্রিল সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুকে 'Poet of Politics' হিসেবে অভিহিত করে। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ কেবল আমাদের নয়, বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্য প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবে।

অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের মহান স্বাধীনতা

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের মহান স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু সবসময় রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২৬শে মার্চ 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' উপলক্ষে এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, এ বছর আমরা উদ্‌যাপন করছি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। এ উপলক্ষে আমি দেশে ও প্রবাসে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর আক্রমণ চালালে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৬শে মার্চ ২০২১ জাতীয় দিবস ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান– পিআইডি

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে দারিদ্র্যের হার কমছে। এক দশকে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে তিনগুণ। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু এখন পুরোপুরি দৃশ্যমান। মেট্রোরেল, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, কর্ণফুলী টানেল, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজও নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ শুধু দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোই নয়, অনেক উন্নত দেশকেও ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

প্রতিবেদন : প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ২৪শে মার্চ ২০২১ তাঁর কার্যালয়ে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ডা. লোটে শেরিং সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন– পিআইডি

নারীকে অধিকার আদায় করে নেওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই মার্চ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন–নারীদের অধিকার দাও বলে শুধু চিৎকার করা বা বক্তৃতা দেওয়া, এতে কিন্তু অধিকার আসে না। নারীদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে তারা ভবিষ্যৎ জীবনে আদর্শ গৃহিণী, জননী ও নারী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। অনুষ্ঠানে জাতীয় পর্যায়ে পাঁচ সংগ্রামী নারীকে জয়িতা পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা পুরস্কারপ্রাপ্তদের মাঝে সম্মাননা পদক, ১ লাখ টাকার চেক, ক্রেস্ট ও সনদ তুলে দেন।

বাংলাদেশ–ভারত মৈত্রী সেতু–১-এর উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৯ই মার্চ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সেতু-১'–এর উদ্‌বোধন করেন। খাগড়াছড়ির রামগড়ে বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তবর্তী ফেনী নদীর ওপর নির্মিত হয় সেতুটি। এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো কোনো নৌ সেতুর মাধ্যমে যুক্ত হলো বাংলাদেশ ও ভারত। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সেতুকে প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের অব্যাহত সহযোগিতার স্মারক হিসেবে বর্ণনা করেন। এ সেতু দুই দেশের মাঝে শুধু সেতুবন্ধই রচনা করবে না বরং ব্যবসাবাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখবে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই সেতুকে দুই দেশের মধ্যে নতুন 'বাণিজ্য করিডোর' হিসেবে বর্ণনা করেন এবং দুই দেশের বাণিজ্য, মানুষে মানুষে সংযোগের ক্ষেত্রে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হলো বলে উল্লেখ করেন। একইসঙ্গে ত্রিপুরার সাবরুমে একটি ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টেরও ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

বাংলাদেশ-মালদ্বীপের মধ্যে চারটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ১৮ই মার্চ মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইবরাহিম মোহাম্মদ সলিহ ঢাকা সফরে আসেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কার্যালয়ে তাঁকে স্বাগত জানান এবং দুই নেতা দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। বৈঠকে যৌথ কমিশন গঠন বিষয়ক দ্বিপক্ষীয় ফরেন অফিস কনসালটেশন বিষয়ক এবং মৎস্য বিষয়ক ও সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ বিষয়ক চারটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। তাঁরা দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সার্বিক দিক পর্যালোচনা করেন এবং উভয় দেশের বিভিন্ন সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলোতে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ থেকে বিশ্বমানের বিভিন্ন সামগ্রী আমদানি করতে মালদ্বীপের প্রতি আহ্বান জানান। মালদ্বীপের রাজধানী মালে ও বাংলাদেশের ৩টি সমুদ্রবন্দরের মধ্যে সরাসরি বাণিজ্যিক জাহাজ চালু করতে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে উভয় নেতা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এছাড়া মালদ্বীপে অবস্থানরত সব প্রবাসীকে বিনামূল্যে টিকা প্রদানের বিষয়ে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের ঘোষণার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ দক্ষিণ এশিয়া গড়তে একযোগে কাজ করার আহ্বান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২৪শে মার্চ ঢাকায় আসেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ডা. লোটে শেরিং। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কার্যালয়ে ভুটানের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান এবং দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ ও ভুটান দুই দেশের মধ্যে ব্যাবসাবাণিজ্য সম্প্রসারণে নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থা চালুর ব্যাপারে একমত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তিকে লাভজনক করে তুলতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। দুই নেতা জাতিসংঘ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে একসঙ্গে কাজ করতে সম্মত হন। ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ভুটানিজ শিক্ষার্থীদের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদি ভিসা ব্যবস্থা চালু করার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অনুরোধ জানান এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি দেখার জন্য নির্দেশ দেন।

প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণেই বাঙালি জাতি নিরস্ত্র থেকে সশস্ত্র হয়েছিল

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে নিরস্ত্র বাঙালি জাতি মুক্তির লক্ষ্যে সশস্ত্র বাঙালিতে রূপান্তরিত হয়েছিল বলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। ৬ই মার্চ চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ১৮ই মার্চ ২০২১ ঢাকায় নগর ভবন প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। তিনি বলেন, বাঙালি ছিল নিরস্ত্র জাতি। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থেকো, শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। সেদিন নিরস্ত্র বাঙালি সশস্ত্র বাঙালিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। যে ভাষণ আজও যে কেউ শুনলে যেভাবে উদ্দীপ্ত হয়, গায়ের লোম যেভাবে খাড়া হয়ে যায়, বিশ্বের কোনো নেতা ইতিহাসে এমন ভাষণ দেননি।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর মতো এমন আবেদনময় ও উদ্দীপ্ত ভাষণ পৃথিবীর ইতিহাসে কেউ দেননি। ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধুর কোনো নোট ছিল না, তিনি একনাগাড়ে বলে গেছেন। পৃথিবীতে অনেক ভাষণ আছে অনেক অর্থবহ। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর এ ভাষণে একটা নিরস্ত্র জনগোষ্ঠীকে সশস্ত্র জনবাহিনীতে রূপান্তর করে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণের পর পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট উদ্ধৃত করে মন্ত্রী বলেন, লেখা হয়েছিল, চতুর শেখ মুজিব প্রকৃত অর্থে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্য তাঁকে অভিযুক্তও করা যাচ্ছে না। এমনভাবে বঙ্গবন্ধু বললেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এর মাধ্যমে সেদিন রিপোর্টার ও তরুণদের উদ্দীপ্ত করেছিল এই ভাষণ। এখনো এই ভাষণ শুনলে মানুষ থমকে দাঁড়ায়, এজন্য বিশ্ব ইতিহাসে এটি একটি বিরল ভাষণ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ অসাধারণ ও অনন্য বিধায় জাতিসংঘের বিশ্ব ঐতিহ্যের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের নাম সংশোধন

১৫ই মার্চ (১লা চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ) এস. আর. ও নং ৭৬-আইন/২০২১ বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫ (৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ Rules of Business, 1996–এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করলেন।

উপরিউক্ত Rules Gi Schedule-1 (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions)-এর Serial No 26 ও এর বিপরীতে উল্লিখিত শিরোনাম Ministry of Information এর পরিবর্তে Ministry of Information and Broadcasting শিরোনামে প্রতিস্থাপিত হলো। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে ১৫ই মার্চ এ তথ্য জানানো হয়েছে।

২৫শে মার্চের কালরাত ছিল জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের সূচনামাত্র

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান বলেন, ২৫শে মার্চের গণহত্যা শুধু এক রাতের হত্যাকাণ্ডই ছিল না। এটা ছিল মূলত বিশ্বসভ্যতার জন্য এক কলঙ্কজনক জঘন্যতম গণহত্যার সূচনামাত্র। অস্ট্রেলিয়ার *দ্য সিডনি মর্নিং হেরাল্ড* পত্রিকার ভাষ্য মতে শুধু ২৫শে মার্চ রাতেই বাংলাদেশে প্রায় ১ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল, যা গণহত্যার ইতিহাসে এক জঘন্যতম ভয়াবহ ঘটনা। পরবর্তী ৯ মাসে একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার লক্ষ্যে ৩০ লাখ নিরপরাধ নারী-পুরুষ-শিশুকে হত্যার মধ্য দিয়ে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা পূর্ণতা দিয়েছিল সেই ঘৃণ্য

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান ২৫শে মার্চ ২০২১ রাজধানীর তথ্য ভবন মিলনায়তনে গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোকচিত্র ও ক্রোড়পত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। এসময় ডিএফপি'র মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়া উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

ইতিহাসকে। প্রতিমন্ত্রী ২৫শে মার্চ রাজধানীর তথ্য ভবন মিলনায়তনে গণহত্যা দিবস উপলক্ষে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, সেনা অভিযানের শুরুতেই হানাদার বাহিনী বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের আগে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশে শুরু হয় স্বাধীনতার যুদ্ধ। নয় মাস সংগ্রামের মাধ্যমে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে অর্জিত হয় কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। তরুণ প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতার ইতিহাস ছড়িয়ে দেবার আহ্বান জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতাবিরোধী চক্র এখনো সমানভাবে সক্রিয়। এদের পরাজিত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি অসাম্প্রদায়িক উন্নত বাংলাদেশ গড়তে হবে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই মার্চ ২০২১ ঢাকায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে মোনাজাত করেন– পিআইডি

ডিএফপি'র মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে আলোচনাসভায় বক্তৃতা করেন জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহীন ইসলাম, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বিধান চন্দ্র কর্মকার, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক আহমেদ কামরুজ্জামান প্রমুখ। এর আগে প্রতিমন্ত্রী আলোকচিত্র ও ক্রোড়পত্র প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন।

প্রতিবেদন : শারমিন সুলতানা শান্তা

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

বিশ্ব নারী দিবস

৮ই মার্চ : সারা দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'বিশ্ব নারী দিবস' পালিত হয়।

একনেকে ছয় প্রকল্পের অনুমোদন

১৬ই মার্চ : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একনেক সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভাপতিত্বকালে প্রধানমন্ত্রী ছয় প্রকল্পের ভার্চুয়ালি অনুমোদন দেন। প্রকল্পের অনুমোদন ব্যয় ৫ হাজার ৬১৯ কোটি ৪৬ লাখ টাকা।

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বাণী প্রদান করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও শিশু দিবস পালিত

১৭ই মার্চ : বিভিন্ন আয়োজন ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও শিশু দিবস।

অমর একুশে বইমেলা

১৮ই মার্চ : প্রতিবছরের মতো এবারো 'অমর একুশে বইমেলা' শুরু হয়। এবারের মেলা ১৮ই মার্চ-১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত চলে।

বিশ্ব পানি দিবস পালিত

২২শে মার্চ : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'বিশ্ব পানি দিবস ২০২১' পালিত হয়েছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য–Valuing Water।

বিশ্ব আবহাওয়া দিবস পালিত

২৩শে মার্চ : সারা দেশে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব আবহাওয়া দিবস'।

গণহত্যা দিবস পালিত

২৫শে মার্চ : ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যা বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম জঘন্য গণহত্যা। সেই লাখো শহিদদের স্মরণ করে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় গণহত্যা দিবস। এ উপলক্ষে সারা দেশে প্রতীকী 'ব্ল্যাক আউট' পালন করা হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রকাশ

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে এসে ১ লাখ ৪৭ হাজার ৫৩৭ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বুদ্ধিজীবীদের নামের চূড়ান্ত তালিকা (প্রথম পর্যায়) প্রকাশ করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ১৯১ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর নামের তালিকাও একইসঙ্গে প্রকাশ করা হয়।

মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত

২৬শে মার্চ : নানা আয়োজন ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'মহান স্বাধীনতা দিবস'।

৫০টি জাতীয় পতাকা সংবলিত সুবর্ণ জয়ন্তী র‍্যালির উদ্‌বোধন

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ৫০টি জাতীয় পতাকা সংবলিত

র‍্যালি দেশের ৬৪টি জেলা প্রদক্ষিণ করে। এ ৫০টি পতাকা ৫০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা বহন করেন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এ র‍্যালির উদ্‌বোধন করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

পবিত্র শবে বরাত পালিত

২৯শে মার্চ : সারা দেশে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালিত হয় পবিত্র শবে বরাত।

প্রতিবেদন : শরিফুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ-ভারত সমঝোতা স্মারক সই

দুই প্রতিবেশী দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়াতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে পাঁচটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। ২৭শে মার্চ বিকালে ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার শীর্ষ বৈঠকে এ স্মারক সই হয় বলে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম জানান। এছাড়া বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্বের ৫০ বছর উপলক্ষে দুই দেশের ডাক বিভাগের স্মারক স্ট্যাম্প উন্মোচন, ভারতের উপহার ১০৯টি অ্যাম্বুলেন্স ও ১২ লাখ ডোজ করোনা টিকা হস্তান্তর হয় এ অনুষ্ঠানে। এ সময় দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী ঢাকা-জলপাইগুড়ি রুটে মিতালী এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল, তিনটি সীমান্ত হাট, শিলাইদহের সংস্কার করা কুঠিবাড়ির বর্ধিত রবীন্দ্র ভবন, আশুগঞ্জে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর শহিদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অবকাঠামোগত উন্নয়নের উদ্‌বোধন করেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ২৭শে মার্চ ২০২১ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৫টি বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়– পিআইডি

দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে প্রথাগত এজেন্ডার বাইরে নতুন বেশ কিছু ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণের ব্যাপারেও দুই প্রধানমন্ত্রী আলোচনা করেন। এগুলো হলো–ডিজিটাল টেকনোলজি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কাটিং এজ এরিয়া, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, নিউক্লিয়ার প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার, উন্নত প্রযুক্তির স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাত এবং বায়োসিকিউরিটি হ্যাজার্ড। মহাকাশ ও স্যাটেলাইট গবেষণায় দুই দেশ একযোগে কাজ করে যেতে সম্মত হয়েছে। বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রীদের জন্য এক হাজার স্কলারশিপের ঘোষণা দিয়েছে ভারত। এছাড়া রোহিঙ্গা ইস্যুতে ভারত বাংলাদেশের অবস্থানকে সমর্থন জানিয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার চুক্তি সই

বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের শোভন কর্মক্ষেত্র ও সম্মানজনক পারিশ্রমিক নিশ্চিত করতে একসঙ্গে কাজ করে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)। ২৭শে মার্চ ঢাকার একটি হোটেলে এ সংক্রান্ত চুক্তি সই করেছে। প্রবাসী কল্যাণ সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন ও বাংলাদেশে আইএলও'র আবাসিক পরিচালক টুমো পৌটিআইনেন নিজ নিজ পক্ষে চুক্তিতে সই করেন।

এ চুক্তির আওতায় প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতার সনদ ও স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে আইএলও কারিগরি সহায়তা দেবে। এছাড়া চাহিদা অনুযায়ী শ্রম রপ্তানিতে সম্ভাব্য বাজার পর্যালোচনা ও অনলাইনে দক্ষতার স্বীকৃতির সনদ দেওয়া, বিশেষ করে স্কিলস পাসপোর্ট প্রবর্তনের মতো উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে। এই উদ্যোগে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আর্থিক সহায়তা দিয়ে পাশে থাকছে।

চুক্তি সই অনুষ্ঠানে আইএলও'র সহযোগিতায় তৈরি তিনটি অনলাইন তথ্য-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উদ্‌বোধন করেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমদ। পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে মন্ত্রণালয় ও জনশক্তি রপ্তানি ব্যুরো প্রবাসী শ্রমিকদের অভিযোগ পর্যালোচনা, শ্রম বিষয়ক কূটনীতিকদের প্রতিবেদন ও রিক্রুটিং এজেন্সির কার্যক্রম তদারকির মতো কার্যক্রম চালাতে পারবে। এ ধরনের পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত কার্যক্রমের তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তরের প্রাথমিক যাত্রা শুরু হলো বলেও অনুষ্ঠানে মন্তব্য করা হয়।

প্রতিবেদন : সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

ছাদ বাগান করলে ট্যাক্স মওকুফ

যে সমস্ত বাসা-বাড়ির ছাদে বৃক্ষ রোপণ অর্থাৎ ছাদ বাগান করা হবে সে সমস্ত বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্স দশ শতাংশ মওকুফ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এখন থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। ১৭ই মার্চ ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন আয়োজিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এ তথ্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন– বাংলাদেশ সকল দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং দ্বিপক্ষীয় সুসম্পর্ক বজায় রাখায় বিশ্বাসী। আমাদের দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে সকল উন্নয়ন সহযোগী দেশ এবং সংস্থাকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা আমাদের দেশকে জানি। আমার দেশের মাটি ও মানুষ, সংস্কৃতি, গাছপালা এবং পশু-পাখিদের জানি। তাই উন্নয়ন প্রকল্প নির্বাচন, বাস্তবায়নে উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার অর্থায়নের সময় আমাদের চিন্তা-চেতনা এবং সিদ্ধান্তের সাথে সমন্বয় করে করা উচিত।

তিনি আরো বলেন, সরকার প্রথম ক্ষমতায় এসে মাত্র সাড়ে তিন বছরে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছে। এছাড়া কৃষি, শিল্পকারখানা তৈরি, বিদ্যুৎ সরবরাহ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তাসহ অনেকগুলো কর্মসূচি হাতে নেয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশের মাথাপিছু আয় ২১০০ ডলারে দাঁড়িয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের এই অভূতপূর্ব উন্নয়নের কারণে বিশ্ব আজ বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে। বাংলাদেশের উন্নয়নের পথপরিক্রমা বিশ্ববাসীর কাছে অনুকরণীয় হয়েছে ।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে নতুন রেকর্ড

দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে নতুন রেকর্ড হয়েছে। ৩রা এপ্রিল ১৩ হাজার ১৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মধ্য দিয়ে এই নতুন রেকর্ড হয়। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-পিডিবি'র পরিচালক (জনসংযোগ) সাইফুল হাসান চৌধুরী এসব তথ্য জানান।

রমজানে কোভিড পরিস্থিতিতে সহায়তা

রমজান মাস উপলক্ষে দেশের দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারের সাহায্যার্থে ২৫শে মার্চ বিতরণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২১ কোটি ৬৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। দেশের ৬৪টি জেলার চার হাজার ৫৬৮টি ইউনিয়নের প্রতিটিতে দুই লাখ ৫০ হাজার টাকা হারে মোট ১১৪ কোটি ২০ লাখ টাকা মানবিক সহায়তা হিসেবে প্রদানের জন্য অর্থ ছাড় করা হয়। সারা দেশের ৩২৮টি পৌরসভার অনুকূলে মোট পাঁচ কোটি ৬৭ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। মুজিববর্ষে কোভিড পরিস্থিতিসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও অসহায় পরিবারকে তাৎক্ষণিকভাবে খাদ্য সহায়তার জন্য এ অর্থ ব্যয় করা হবে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ডিজিটাল সার্ভিস অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনে বাংলাদেশ–ভারত সমঝোতা

'বাংলাদেশ-ভারত ডিজিটাল সার্ভিস অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং সেন্টার (বিডিসেট)' নামের একটি প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। ২৭শে মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশের পক্ষে আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম এবং ভারতের পক্ষে ভারতীয় হাই-কমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এই সমঝোতার আওতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও আইসিটি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক ২৪শে মার্চ ২০২১ আইসিটি বিভাগ আয়োজিত আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল মিলনায়তনে তিনদিনব্যাপী ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো-২০২১ উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন– পিআইডি

শিল্পের বিকাশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ২৫ কোটি টাকা ভারতীয় অনুদান দেওয়া হবে। এই প্রকল্পে মোট ৬১ কোটি টাকার বেশি ব্যয় করা হবে যার বাকি অংশ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থায়ন করা হবে।

ডাকঘরের ডিজিটাল রূপান্তরের কার্যক্রম শুরু

প্রচলিত ডাক সেবাকে ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরের কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার। ২৭শে মার্চ ঢাকায় ডাকভবনে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ পোস্ট অফিস কর্মচারী ইউনিয়ন আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা জানান।

মন্ত্রী বলেন, ডাকঘরের প্রতিটি কর্মকাণ্ড ডিজিটাল করতে ডাক সেবায় নিয়োজিত প্রতিটি স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ন্যূনতম ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন করা অপরিহার্য। ডাক সেবার প্রতি হারানো আস্থা ফিরিয়ে আনতে ডিজিটালাইজেশনের পাশাপাশি ডাকঘরকে মানুষের আস্থার জায়গায় উপনীত করার কোনোও বিকল্প নেই। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতায় ডিজিটাল ডাকঘর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের আরো তৎপর হওয়ার নির্দেশ দেন।

আইসিটি বিভাগের সব উদ্যোগ যুবসমাজ ও কর্মসংস্থানের জন্য

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, আমাদের সমস্ত উদ্যোগ এবং প্রকল্পগুলোর মূল ফোকাস-যুবসমাজ, আইসিটি এবং কর্মসংস্থান। ৪ঠা মার্চ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আইসিটি বিভাগ ও রবির মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। দেশের বৃহত্তম মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন প্ল্যাটফর্ম বিডি অ্যাপসকে (www.bdapps.com) জাতীয় অ্যাপ স্টোর হিসেবে ঘোষণা দেন প্রতিমন্ত্রী। এসময় তিনি বলেন, এই চুক্তির মাধ্যমে ডেভেলপাররা আইসিটি বিভাগের বর্তমান প্রশিক্ষণ সুবিধা পাবেন এবং বিডিঅ্যাপসের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে আর্থিকভাবেও লাভবান হবেন। সরকার বিডিঅ্যাপসের সঙ্গে একত্রিত হয়ে দেশের গতিশীল যুবসমাজকে ডিজিটাল উদ্ভাবন ত্বরান্বিত করাবে।

প্রতিবেদন : সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

কচুরিপানার হস্তশিল্প যাচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকায়

কাঁচা কচুরিপানা গোখাদ্য ও শুকনো কচুরিপানা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হলেও সেই কচুরিপানা থেকে গাইবান্ধায় তৈরি হচ্ছে ফুলের টব, হ্যান্ড ব্যাগ, পাপস, ঝুড়িসহ নানা ধরনের হস্তশিল্প। কচুরিপানা থেকে তৈরি এসব হস্তশিল্প যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, কানাডা ও নেদারল্যান্ডসের মতো দেশে। কচুরিপানাকে এমন নান্দনিক রূপ দিয়েছেন গাইবান্ধার ফুলছুরি উপজেলার কঞ্চিপাড়া

ইউনিয়নের মদনেরপাড়ার নারীরা। কচুরিপানা থেকে হস্তশিল্পের কাজ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন এলাকার ২৪৫ জন দরিদ্র নারী।

ঘুরে দাঁড়াচ্ছে পণ্য রপ্তানি

করোনাভাইরাস মহামারির নতুন বিস্তারের মধ্যে চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে পণ্য রপ্তানি আয়ে বাংলাদেশ আগের একই সময়ের চেয়ে সামান্য পিছিয়ে রয়েছে। তবে শুধু মার্চ মাসে রপ্তানি আয়ে বেশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় দশমিক ১২ শতাংশ কম। তবে শুধু মার্চ মাসে বাংলাদেশ থেকে ৩০৭ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১২ দশমিক ৫৯ শতাংশ বেশি। দেশের পণ্য রপ্তানি আয়ের এই চিত্র ৬ই এপ্রিল উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) প্রকাশিত হালনাগাদ পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে। এ সময় হোম টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি হয়েছে ৮৪ কোটি ডলারের যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৯ শতাংশ বেশি। আগের অর্থবছরের একই সময়ে রপ্তানি হয়েছিল ৫৯ কোটি ডলারের হোম টেক্সটাইল। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি-পণ্য। এ সময়ের মধ্যে মাত্র ৬৭ কোটি ডলারের চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির টার্গেট নিয়ে ৬৮ কোটি কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানির সাফল্য পাওয়া গেছে।

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

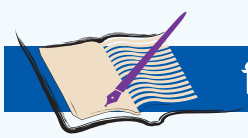

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক শিক্ষা মেলা অনুষ্ঠিত

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ১১ ও ১২ই মার্চ দুই দিনব্যাপী 'আন্তর্জাতিক শিক্ষা মেলা' অনুষ্ঠিত হয়। ফরেন অ্যাডমিশন অ্যান্ড ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট কনসালট্যান্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এ মেলার আয়োজন করে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন এ মেলার উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দেশের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি জমায়। এর বেশির ভাগই দেশে ফিরে আসে না। এলক্ষ্যে তারা যাতে দেশে এসে তাদের মেধা দেশের স্বার্থে কাজে লাগায় সেদিকে সবাইকে দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা প্রকাশ

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০২১ প্রকাশ করেছে সরকার। ২৮শে মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এ নীতিমালা দেওয়া হয়। নীতিমালা অনুযায়ী যারা সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন তারা আগের মতোই এ পদে বহাল থাকবেন। তবে এ নীতিমালা জারির পর প্রভাষকরা পদোন্নতি পেয়ে জ্যেষ্ঠ প্রভাষক হবেন। বেসরকারি কলেজগুলোতে আর সহকারী অধ্যাপক পদবি থাকবে না। এছাড়া কলেজে যারা সহকারী গ্রন্থাগারিক কাম ক্যাটালগার হিসেবে কর্মরত আছেন তাদের পদবি সহকারী শিক্ষক হিসেবে পরিবর্তিত হবে। এছাড়া স্নাতক (পাস) কলেজে যারা গ্রন্থাগারিক হিসেবে কর্মরত আছেন তাদের পদবি গ্রন্থাগার প্রভাষক হিসেবে পরিবর্তিত হবে। নীতিমালায় বলা হয়েছে এমপিওভুক্ত কোনো শিক্ষক একইসঙ্গে একাধিক পদে/চাকরিতে বা লাভজনক পদে নিয়োজিত থাকতে পারবেন না। এটি তদন্তে প্রমাণিত হলে সরকার তার এমপিও বাতিলসহ দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে। সরকার চাইলে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে প্রধান হিসেব শিক্ষক/কর্মকর্তা প্রেষণে নিয়োগ দিতে পারবে। এছাড়া শিক্ষক/কর্মচারীদের মূল বেতন/বোনাসের নির্ধারিত অংশ/উৎসব ভাতার নির্ধারিত অংশ বা বৈশাখি ভাতার নির্ধারিত অংশ সরকারের জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ বা সরকারের সর্বশেষ জাতীয় বেতন স্কেলের সঙ্গে মিল রেখে করতে হবে।

প্রতিবেদন : মো. সেলিম

বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ মার্কিন বিনিয়োগকারীদের লাভজনক গন্তব্য

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশ এখন বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা কমিয়েছে। ফলে লাখ লাখ যুবকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তাও বেড়েছে। ফলে বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দ্রুত বর্ধনশীল অভ্যন্তরীণ বাজার এবং ক্রমবর্ধমান কানেক্টিভিটির সঙ্গে চার বিলিয়ন মানুষের বিশাল আঞ্চলিক বাজার মার্কিন ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য লাভজনক বিনিয়োগ গন্তব্য।' ৬ই এপ্রিল বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র বিজনেস কাউন্সিলের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে এক ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য আরও সম্প্রসারণে পর্যাপ্ত নীতিগত সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন 'আমরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শিল্প কাঁচামাল, তুলা, সয়াবিন এবং গমসহ বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য আমদানি করি। এসব পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানিকারকরা বাংলাদেশে শূন্য শুল্ক ভোগ করে। দুই দেশের ব্যাবসাবাণিজ্য আরও সম্প্রসারণে পর্যাপ্ত নীতিগত সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ।' বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও উন্নয়নের যাত্রায় যুক্তরাষ্ট্র শক্তিশালী অংশীদার হয়ে দাঁড়িয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র আমাদের রপ্তানির বৃহত্তম গন্তব্য, সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের বৃহত্তম উৎস, দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন অংশীদার এবং প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।' এছাড়া পণ্য উৎপাদনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোকে বাংলাদেশের

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই এপ্রিল ২০২১ এক ধারণকৃত বক্তব্যের মাধ্যমে ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের উদ্‌বোধন করেন– পিআইডি

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো ব্যবহারের প্রস্তাব করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিদেশি বিনিয়োগের সুবিধার জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত অবকাঠামো, আইনি এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নতি করে যাচ্ছে। আমাদের সরকার দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে সারাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছে।'

বাংলাদেশের জন্য ইউএসএআইডি'র কমপ্রিনহেনসিভ প্রাইভেট সেক্টর মূল্যায়ন ২০১৯ অনুসারে, বাংলাদেশে আইসিটি শিল্প ২০২৫ সালের মধ্যে প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং প্রায় পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছবে।' এছাড়া বাংলাদেশের হাইটেক পার্কগুলোতে মার্কিন কোম্পানিগুলোকে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'তথ্যপ্রযুক্তি সেক্টরে স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ২৮টি হাইটেক পার্ক তৈরি করছে। এখানে উপযুক্ত বিনিয়োগের মাধ্যমে আমেরিকার প্রতিষ্ঠানগুলো সুসম্পর্ক আরো বাড়াতে পারে।'

প্রতিবেদন: এইচ কে রায় অপু

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

অন্যতম অনুপ্রেরণাদায়ী নেতা শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অন্যতম অনুপ্রেরণাদায়ী নারী নেত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করেন কমনওয়েলথ মহাসচিব প্যাট্রেসিয়া স্কটল্যান্ড। তিনি ৪ঠা মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর সরকারপ্রধানদের মধ্যে 'অসাধারণ নারী নেতৃত্ব ও গভীর অনুপ্রেরণাদায়ী' তিনজনের নাম উল্লেখ করে নিজের টুইটারে একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করেন। এর মধ্যে শেখ হাসিনা অন্যতম বলে উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, অন্য দুজন হলেন– নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডা আরডার্ন ও বার্বাডোসের প্রধানমন্ত্রী মিয়া আমোর মোটলে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ৮ই মার্চ পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। সরকারি-বেসরকারি নানা কর্মসূচির মাধ্যমে পালিত হয়েছে দিনটি। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'করোনাকালে নারী নেতৃত্ব, গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব'। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বাণীতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব নারীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বিশ্বে পার্লামেন্ট সদস্যদের চারজনে একজন নারী

বিশ্বে ২০২০ সালে পার্লামেন্টে নারী সদস্য সংখ্যা ০.৬ শতাংশ বেড়েছে। এর মধ্য দিয়ে পার্লামেন্টে নারীর সংখ্যা ২৫.৫ শতাংশে পৌঁছেছে। অর্থাৎ বিশ্বের প্রতি চারজন পার্লামেন্ট সদস্যদের একজন নারী। ৮ই মার্চ 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' উপলক্ষে জাতিসংঘের অংশীদারি প্রতিষ্ঠান ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। ৫ই মার্চ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়।

শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের চার নারী বিচারক

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের চারজন নারী বিচারক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ নিয়েছেন। তাদের মধ্যে তিনজন দক্ষিণ সুদানে ও একজন সোমালিয়ায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করবেন। ৭ই মার্চ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এক বছর প্রেষণে জাস্টিস অ্যাডভাইজার হিসেবে বিচারব্যবস্থা পুনর্গঠন ও উন্নয়নে কাজ করবেন এই বিচারকেরা। যে চারজন নারী বিচারক নিয়োগ পেয়েছেন তারা হলেন– মুন্সিগঞ্জের যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আফসানা আবেদীন, টাঙ্গাইলের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নওরিন মাহবুবা, কক্সবাজারের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা জজ) জেবুন্নাহার আয়শা এবং জামালপুরের যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ লুবনা জাহান।

উইমেন ইন লিডারশিপ পুরস্কার পেলেন শুক্লা সারওয়াত

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এ বছর সার্ক উইমেন অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ প্রদত্ত উইমেন ইন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন গুলশান সোসাইটির সেক্রেটারি জেনারেল ব্যারিস্টার শুক্লা সারওয়াত সিরাজ। ২০শে মার্চ রাজধানীর গুলশানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তার হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মালদ্বীপের রাষ্ট্রদূত শিরুজিমাত সামির।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

৩০ হাজার ঘর পাবে বীর মুক্তিযোদ্ধারা

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ৩০ হাজার অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাকে একতলা পাকা ঘর দিবে সরকার। 'মুজিববর্ষে কেউ গৃহহীন থাকবে না' সরকারের এমন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে এবার অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসনের জন্য প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এটি বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ হাজার ১২২ কোটি ৯৯ লাখ টাকা। ১৬ই মার্চ 'বীরনিবাস' প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও সচিবরা রাজধানীর পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অবস্থান নিয়ে একনেকে অংশগ্রহণ করেন। এ বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক যুগান্তরকে বলেন, 'প্রথমে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বসবাসের জন্য ১৪ হাজার পাকা বাড়ি নির্মাণ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল সরকারের। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সেই সংখ্যা বাড়িয়ে ৩০ হাজার করা হয়েছে। অর্থাৎ বীর মুক্তিযোদ্ধার জন্য ৩০ হাজার 'বীর নিবাস' তৈরি করে দেওয়া হবে।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই এপ্রিল ২০২১ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২১ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যারা অসচ্ছল তারাই এসব বাড়ি বরাদ্দ পাবেন। প্রতিটি বাড়ির রং হবে জাতীয় পতাকার রং লাল-সবুজের সমন্বয়ে। এসব বাড়ির নাম হবে 'বীর নিবাস'। প্রতিটি বাড়ির আয়তনও হবে একই সমান। দুটি বেডরুম, বারান্দাসহ একতলা বিশিষ্ট প্রতিটি বাড়িতে থাকবে আলাদা বাথরুম, টিউবওয়েল। গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি পালনের

জন্য থাকবে পৃথক শেড। প্রতিটি বাড়ির নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬ লাখ টাকা। প্রাথমিকভাবে ১৪ হাজার ঘরের জন্য ২ হাজার ৭৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে এ সংক্রান্ত একটি প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। পরে মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে এ বীর নিবাসের সংখ্যা দ্বিগুণ করে ৩০ হাজার ঘর নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। প্রস্তাব অনুযায়ী, প্রতিটি বাড়ি হবে ৯৮০ বর্গ ফুটের। চার ডেসিমাল জমিতে ৯০০ বর্গফুট আয়তনের এক একটি ভবনের নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে চলতি বছর থেকে ২০২৩ সালের অক্টোবরের মধ্যে এটি বাস্তবায়ন করবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রণোদনা বাবদ কৃষিযন্ত্র পাচ্ছেন কৃষক

সারা দেশে কৃষকদের মধ্যে কম্বাইন হারভেস্টার, রিপারসহ বিভিন্ন কৃষিযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আজকে আমরা যে কৃষকদের কৃষিযন্ত্র দিচ্ছি এটি কৃষি ক্ষেত্রে সরকারের নতুন একটি অধ্যায়। আগামী ৫ বছর আমরা এই প্রণোদনা দেব। ৬ই এপ্রিল সচিবালয় থেকে ১৩টি স্পটে এই কৃষিযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম উদ্‌বোধনকালে তিনি একথা বলেন। কৃষিমন্ত্রী জানান, চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় দেশের ৫০০টি উপজেলায় এক হাজার ৬১৭টি কম্বাইন হারভেস্টার, ৭০১টি রিপার, ১৮৪টি রাইস ট্রান্সপ্লান্টারসহ মোট ৫ হাজার ৭৭৬টি কৃষিযন্ত্র বিতরণ করা হবে। জানা গেছে, সরকারের কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় মোট ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার এসব যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৮৩ হাজার হেক্টর বেশি জমিতে বোরোর আবাদ

সারা দেশের বোরো ধান সফলভাবে ঘরে তুলতে পারলে করোনাকালেও দেশে খাদ্য নিয়ে ঝুঁকি থাকবে না বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, মহামারি করোনাকালে খাদ্য নিয়ে মানুষকে যাতে আতঙ্কে থাকতে না হয়, খাদ্যের যাতে কোনো অভাব না হয় সরকার সেটি নিশ্চিত করতে দৃঢ়ভাবে কাজ করছে। ১লা এপ্রিল মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে অনলাইনে সুনামগঞ্জের দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার জয়কলস ইউনিয়নের আস্তানা গ্রামে বোরো ধান কর্তন উদ্‌বোধনকালে এ কথা বলেন তিনি। কৃষিমন্ত্রী বলেন, বোরো মৌসুমে দেশে সবচেয়ে বেশি ধান চাল উৎপাদন হয়। সেজন্য হাওরসহ সারা দেশের ধান কাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আনুষ্ঠানিকভাবে ধান কাটা উদ্‌বোধন করা হচ্ছে যাতে মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। কৃষিমন্ত্রী আরো বলেন, এ বছর প্রায় ৪৮ লাখ হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এই লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে সারা দেশে ৪৮ লাখ ৮৩ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৮৩ হাজার হেক্টর বেশি জমিতে বোরো আবাদ হয়েছে। এছাড়া উৎপাদনশীলতা বেশি হওয়ায় হাইব্রিড জাতের ধানের চাষ বৃদ্ধিতে এ বছর জোর দেওয়া হয়। সেজন্য গত বছরের তুলনায় প্রায় ৩ লাখ হেক্টর জমিতে হাইব্রিড জাতের আবাদ বেড়েছে। গড়ে হেক্টর প্রতি ১ টন করে বেশি ফলন হলেও কমপক্ষে ৩ লাখ টন উৎপাদন বাড়বে। এ বছর বোরোতে ২ কোটি ৫ লাখ টন চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এছাড়া বোরো ধানের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার এ বছর বেশি করে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণ প্রণোদনা দিয়েছে। শুধু হাইব্রিড জাতের ধানের চাষ বৃদ্ধিতে দেওয়া হয়েছে প্রায় ৭৩ কোটি টাকার প্রণোদনা। এতে করে কৃষকেরা উৎসাহিত হয়েছে।

কৃষি গবেষণায় পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে সরকার

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, এক সময় দেশে গবেষণার প্রায় পুরোটাই ছিল বিদেশি সাহায্যনির্ভর। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষি গবেষণায় ও কৃষির উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে উদারভাবে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে। সেজন্য প্রযুক্তিতে বিদেশ নির্ভরতা অনেকাংশে কমেছে। গবেষণা সম্প্রসারণের মাধ্যমে লাগসই দেশীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চাষাবাদ, উপকরণ ব্যবহার ও অর্গানিক পদ্ধতিতে উৎপাদনসহ সকল কৃষিপ্রযুক্তি নিজেদেরকে আরো বেশি উদ্ভাবন ও তা দ্রুততার সাথে সম্প্রসারণ করতে হবে। ৭ই মার্চ রাজধানীতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) আয়োজিত সংস্থাটির 'সার্বিক অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা' বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। এসময় কেজিএফ'কে বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থের যথাযথ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের নির্দেশ দেন কৃষিমন্ত্রী।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ৬ই এপ্রিল ২০২১ ঢাকায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে উন্নয়ন সহায়তা (ভরতুকি) কার্যক্রমে কৃষিযন্ত্র বিতরণের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন– পিআইডি

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন ২৮শে মার্চ ২০২১ হোটেল সোনারগাঁও-এ জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়ন এবং বাগান ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দুটি প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করেন। এসময় উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশ বিশ্বে রোল মডেল

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশ বিশ্বের রোল মডেল। ২৮শে মার্চ প্যান প্যাসিফিক হোটেল সোনারগাঁওয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, দেশকে 'ক্লিন ও গ্রিন' করার লক্ষ্যপূরণে আন্তরিকভাবে কাজ করা হচ্ছে। নিজস্ব অর্থায়নে গঠিত ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে জলবায়ু অভিযোজনমূলক বিভিন্ন সফল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের নজর কেড়েছে। পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বাংলাদেশের উপকূলীয় বনায়ন ও পুনঃবনায়নে কমিউনিটিভিত্তিক অভিযোজন কর্মসূচি (আইসিবিএএআর) দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম সফল অ্যাডাপ্টেশন প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় দেশের উপকূলীয় ৫টি জেলার ৮টি উপজেলায় বাস্তবায়িত থ্রিএফভি (ফরেস্ট, ফ্রুট, ফিস, ভেজিটেবলস) মডেলসহ অন্যান্য অভিনব অভিযোজন কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় যৌথ প্রচেষ্টা প্রয়োজন

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় যৌথ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এক্ষেত্রে তরুণদের নতুন ও উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনায় গতিশীলতা এনে দিতে পারে বলে জানিয়েছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

১২ই মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টার আয়োজিত গ্লোবাল ইয়ুথ ক্লাইমেট সামিট ২০২১–এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে স্পিকার এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টার আয়োজিত সামিটের ফলস্বরূপ ছয়টি মহাদেশের তেরো থেকে চব্বিশ বছর বয়সি পাঁচশ তরুণ বিশ্বব্যাপী যুব প্রতিশ্রুতি চালুকরণের মাধ্যমে বিশ্ব জলবায়ু বিপর্যয় এড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবেন জেনে স্পিকার সন্তোষ প্রকাশ করেন। স্যার ক্রিস্টোফার বল ও তার স্ত্রীকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় উদ্ভাবনী ধারণা প্রদানকারী ও ইভেন্ট বিজয়ী ১২ জন অগ্রসর তরুণ ব্যক্তিত্বকে স্কলারশিপ প্রদানের জন্য স্পিকার অভিনন্দন জানান।

প্রতিবেদন : সানজিদা আহমেদ

বিদ্যুৎ: বিশেষ প্রতিবেদন

মুজিববর্ষ উপলক্ষে ডিপিডিসি'র ভ্রাম্যমাণ বিদ্যুৎসেবা প্রদান

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে গ্রাহকদের দোড়গোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে ভ্রাম্যমাণ বিদ্যুৎসেবা দিচ্ছে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)। রাজধানীর ৩৬টি জোনে ট্রাকে করে ভ্রাম্যমাণ এই সেবা দেওয়া হচ্ছে। দোরগোড়ায় এই সেবা পেয়ে সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন গ্রাহকরা।

ডিপিডিসি জানায়, গ্রাহকদের সেবা দিতে তিনটি ছোটো ট্রাকের মাধ্যমে প্রতিটি জোনে একদিন করে এই সেবা দেওয়া হচ্ছে। ১৮ই মার্চ রাজধানীর শাহজাহানপুর, শ্যামলী ও নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা এলাকা থেকে শুরু হয় এই কার্যক্রম। ২০শে মার্চ ডিপিডিসি ভ্রাম্যমাণ বিদ্যুৎসেবা দিয়েছে গেন্ডারিয়া থানা এলাকায়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে মার্চ ২০২১ প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে নতুন আন্তঃদেশীয় ট্রেন 'মিতালী এক্সপ্রেস' উদ্‌বোধন করেন– পিআইডি

জানা যায়, ডিপিডিসি'র ভ্রাম্যমাণ ট্রাকের সঙ্গে টেকনিক্যাল টিম, ইঞ্জিনিয়ার এবং চারটি মোটরসাইকেল রয়েছে। গ্রাহকরা আবেদন করার পর কর্মকর্তারা চাহিদা নোট তৈরি করেন। মোটরসাইকেলে করে অফিসে গিয়ে সব কাজ শেষ করে মিটার স্থাপন করে দেওয়া হয়।

ভ্রাম্যমাণ মিনিট্রাকে যেসব সেবা দেওয়া হচ্ছে তাহলো– অনলাইনে নতুন সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি/হ্রাস, অনলাইনে ট্যারিফ, মিটার ও নাম পরিবর্তন, বিদ্যুৎ বিল সংশোধন, পেমেন্ট সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান, প্রিপেইড মিটারের ভেন্ডিং ও অন্যান্য সমস্যা সমাধান, বিল প্রদানের ছাড়পত্র, তাৎক্ষণিক অভিযোগ গ্রহণ ও সমাধানের ব্যবস্থা করা। এছাড়া বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা সম্পর্কে গ্রাহকদের তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সচেতন করা। এই সেবা ১৮ই মার্চ থেকে শুরু করে ১লা এপ্রিল পর্যন্ত ডিপিডিসি'র আওতাভুক্ত বিভিন্ন স্থানে দেওয়া হয়। শুক্রবার ছাড়া ১২ দিন দেওয়া হয় এ সেবা।

প্রতিবেদন : রিপা আহমেদ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা-নিউ জলপাইগুড়ি 'মিতালী এক্সপ্রেস' ট্রেন উদ্‌বোধন

ঢাকা থেকে ভারতের নিউ জলপাইগুড়ি জংশন পর্যন্ত যাত্রীবাহী ট্রেন 'মিতালী এক্সপ্রেস' উদ্‌বোধন করা হয়েছে। ২৭শে মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই ট্রেনের উদ্‌বোধন করেন। এর আগে দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেনটির আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন হয়েছে। এ সময় ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন রেলওয়ের মহাপরিচালক ধীরেন্দ্র নাথ মজুমদারসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ট্রেনটির নামকরণ করেছেন 'মিতালী এক্সপ্রেস'। ঢাকা-জলপাইগুড়ি ট্রেন চলাচল শুরু করতে গত বছর বাংলাদেশের চিলাহাটি থেকে ভারতের হলদিবাড়ী পর্যন্ত রেলপথ পুনর্নির্মাণ করা হয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে সরকারের পদক্ষেপসমূহ

ঢাকার ওপর গাড়ির চাপ কমাতে আউটার রিং রোড বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ (সওজ)। আট লেনের বৃত্তাকার এ সড়কপথের দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ১৩২ কিলোমিটার। দুটি পর্বে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এতে সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫ হাজার কোটি টাকা। সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রথম পর্বে সাভারের হেমায়েতপুর থেকে কেরানীগঞ্জের মদনপুর পর্যন্ত আট লেনের ৪৮ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করা হবে। এর মধ্যে বর্তমানে চার লেনের ১২ কিলোমিটার সড়ক রয়েছে।

দেশের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরগুলোর যাত্রী ও কার্গো হ্যান্ডলিং সক্ষমতার মান ও পরিধি বৃদ্ধির অংশ হিসেবে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণকাজ চলমান। কক্সবাজার ও সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীতকরণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। বাগেরহাট খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণসহ যশোর, সৈয়দপুর ও বরিশাল বিমানবন্দর এবং রাজশাহীর শাহ মখদুম বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ ও নবরূপায়ণের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার।

প্রতিবেদন : মো. সৈয়দ হোসেন

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

কমিউনিটি ভিশন সেন্টার উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ৫টি বিভাগের আওতাধীন ২০টি জেলার ৭০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থাপিত 'কমিউনিটি ভিশন সেন্টার'-এর কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন। গণভবন থেকে ১১ই মার্চ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর এদেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ শুরু করি,

স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করি। কমিউনিটি ভিশন সেন্টার তারই একটি। এর মাধ্যমে অনলাইনেও চক্ষু সেবা সারা দেশে পৌঁছে যাচ্ছে। আরো ১১০টি ভিশন কমিউনিটি সেন্টার স্থাপনের বিষয়ে চিন্তা রয়েছে সরকারের এবং চোখে ছানি পড়া গ্লুকোমা বা ডায়াবেটিস, রেটিনোপ্যাথি বা শিশুর চোখে আঘাতজনিত চিকিৎসা, পাওয়ার চশমার ব্যবস্থাপনা সরকারিভাবে দেওয়ারও উদ্যোগ নিয়েছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

ডায়াবেটিসের নতুন ওষুধ এল বাজারে

দেশে ডায়াবেটিস চিকিৎসা সপ্তাহে একবার ব্যবহারের উপযোগী নতুন এক ওষুধ এসেছে বাজারে। এই ওষুধের মলিকিউয়ের নাম সিমাগ্লুটাইড। টাইপ-২ ডায়াবেটিস চিকিৎসায় ওষুধটি বাংলাদেশের বাজারে এনেছে ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান নভো নরডিস্ক। ১৮ই মার্চ রাজধানীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ ওষুধ বাজারজাত করার কথা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি একে আজাদ খান বলেন, সপ্তাহে একবার সিমাগ্লুটাইড ব্যবহারে রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ, শরীরের ওজন কমানো ও হৃদযন্ত্র ভালো রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে– যা ডায়াবেটিসের মতো জটিল রোগের চিকিৎসায় এক অনন্য সংযোজন। বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত উইনি এসট্রাপ পিটারসন বলেন, ডায়াবেটিস রোগের জন্য গবেষণামূলক ও উদ্ভাবনী ওষুধ আনতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখছে নভো নরডিস্ক।

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

৪৩তম বিসিএসে আবেদনের সময় বাড়ল

৪৩তম বিসিএসের আবেদনের সময় আগামী ৩০শে জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ২৯শে মার্চ ২০২১ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৪৩তম বিসিএসের আবেদনের সময় ৩১শে মার্চের পরিবর্তে ৩০শে জুন সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পুনর্নির্ধারণ করা হয়। এ সময়ের মধ্যে যারা আবেদন করবেন তারা ৩রা জুলাই সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আবেদনের ফি জমা দিতে পারবেন।

৪৩তম বিসিএসের সংশোধিত নির্দেশনা হলো– যদি কোনো প্রার্থী এমন কোনো পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন যে পরীক্ষায় পাস করলে তিনি ৪৩তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেন এবং যদি তার ওই পরীক্ষার ফল ৪৩তম বিসিএস পরীক্ষার আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ পর্যন্ত প্রকাশিত না হয়, তাহলেও তিনি অবতীর্ণ প্রার্থী হিসেবে অনলাইনে আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবেন। তবে তা সাময়িকভাবে গ্রহণ করা হবে। কেবল সেই প্রার্থীকেই অবতীর্ণ প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করা হবে যার স্নাতক বা স্নাতকোত্তর সব লিখিত পরীক্ষা আগামী ৩০ জুনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে শেষ হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ই মার্চ ২০২১ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের ৭০টি উপজেলায় 'কমিউনিটি ভিশন সেন্টার' উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে পীরগঞ্জ, নাচোলর ও হালুয়াঘাট উপজেলায় উপকারভোগীদের সাথে কথা বলেন– পিআইডি

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালন

অন্যান্য বছরের মতো এবারো ২৪শে মার্চ জাতীয়ভাবে বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালন করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। যক্ষ্মা দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য– 'সময় বয়ে যাচ্ছে' বা 'দ্য ক্লক ইজ টিকিং'। তবে বাংলাদেশে স্বাধীনতার ৫০ বছর ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবারের যক্ষ্মা দিবসের প্রতিপাদ্যে কিছুটা পরিবর্তন এনেছে। তারা প্রতিপাদ্য ঠিক করেছে 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, যক্ষ্মামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার'। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে ২৩শে মার্চ দেওয়া এক তথ্যে বলা হয়েছে, বর্তমান চিকিৎসায় ৯৬ শতাংশ যক্ষ্মা রোগী সুস্থ হয়ে যাচ্ছেন।

প্রতিবেদন : মো. আশরাফ উদ্দিন

৫৪ হাজার শিক্ষক নিয়োগে এনটিআরসিএ'র গণবিজ্ঞপ্তি জারি

দেশের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) বিষয়ের প্রবেশ পর্যায়ে শূন্যপদ পূরণে শিক্ষক হতে আগ্রহী নিবন্ধনধারী প্রার্থীদের নিকট থেকে শর্ত সাপেক্ষে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। ৩০শে মার্চ ২০২১ তৃতীয় গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে এনটিআরসিএ।

গণবিজ্ঞপ্তিতে স্কুল ও কলেজে এমপিও পদে ২৬ হাজার ৩৮ জন এবং নন-এমপিও পদে ৪২৬৩ জন সহ মোট ৩১ হাজার ১০১০ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়। মাদ্রাসা,

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ১৮ই মার্চ ২০২১ 'অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা: যুবদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের অগ্রাধিকার ও জাতীয় বরাদ্দ' শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা' সভায় বক্তৃতা করেন– পিআইডি

কারিগরি ও ব্যবসায় ব্যবস্থায় এমপিও পদে ১৯ হাজার ১৫৪ জন এবং নন-এমপিও পদে ১৮৪২ জনসহ মোট ২০ হাজার ৯৯৬ জন। এছাড়া সংরক্ষিত এমপিও পদে ২ হাজার ২০৭ জন নিয়োগ দেওয়া হবে। এমপিও পদে মোট ৪৮ হাজার ১৯৯ জন এবং নন-এমপিও পদে ৬ হাজার ১০৫ জন মিলিয়ে মোট ৫৪ হাজার ৩০৪টি পদে লোক নিয়োগ দেওয়া হবে।

গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের লিভ টু আপিল ৩৪৩/২০১৯ মামলার রায়ে বাস্তবায়নের স্বার্থে ২ হাজার ২০৭টি পদ সংরক্ষিত রেখে ৫২ হাজার ৯৭টি পদে শূন্য পদের বিষয় ও পদভিত্তিক তালিকা এনটিআরসিএ'র ওয়েবসাইটে (www.ntrca.gov.bd) এবং টেলিটকের ওয়েবসাইট (http://ngi.teletalj.com.bd) ১লা এপ্রিল প্রকাশ করা হয়েছে।

আবেদনকারীকে অবশ্যই এনটিআরসিএ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিবন্ধনধারী এবং সমন্বিত মেধা তালিকাভুক্ত হতে হবে। এছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ থেকে জারিকৃত সর্বশেষ জনবল কাঠামো অনুযায়ী কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। আবেদনকারীর বয়স ১লা এপ্রিল পর্যন্ত ৩৫ বছর হতে হবে। তবে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ইনডেস্কধারী প্রার্থী এবং সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ৩৯০০/২০১৯ নং মামলার রায় অনুযায়ী ২০১৮ সালের ১২ই জুনের আগে যারা শিক্ষক নিবন্ধন সনদ লাভ করেছেন তাদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য। প্রত্যেক আবেদনের জন্য আবেদনকারীকে ১০০ টাকা ফি জমা দিতে হবে।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে পাতাল রেল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার

ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে সাবওয়ে (পাতাল রেল) নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এলক্ষ্যে ২৪শে মার্চ মহানগরীর একটি হোটেলে সাবওয়ে নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত ছিলেন সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। এ সময় অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূত ফ্রান্সিস ডি আসিস বেনিতেজ সালাস উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, সাবওয়ে নির্মিত হলে ঢাকা শহরের প্রায় ৮০ লাখ কর্মজীবী মানুষের মধ্যে অর্ধেক অর্থাৎ ৪০ লাখ মানুষ মাটির নিচে পাতাল রেলে চলাচল করবে এবং মাটির উপরিভাগে যানজট ও জনজট মুক্ত থাকবে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য করে তিনি আরো বলেন, শেখ হাসিনা সরকারের সকল কাজের উদ্দেশ্য জনকল্যাণমূলক। জনস্বার্থে কাজ করতে হবে, কমাতে হবে জনভোগান্তি। বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন একই ধরনের প্রকল্পগুলোর সাথে বাড়াতে হবে সমন্বয়। কাজের গুণগত মান সুরক্ষার পাশাপাশি নির্ধারিত সময়ে নির্মাণকাজ শেষ করতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রামে ওয়ান সিটি টু টাউনের আদলে কর্ণফুলি নদীর তলদেশ দিয়ে নির্মিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু টানেল। ইতোমধ্যে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ একটি টিউবের রিং প্রতিস্থাপনসহ বোরিং কাজ শেষ হয়েছে এবং এরইমধ্যে টিউবটির ২০০ মিটার রোড স্প্যান নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় টিউবটির ৭০০ মিটার বোরিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যন্ত টানেলের নির্মাণকাজের অগ্রগতি শতকরা ৬৫ ভাগ।

সুষম যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য রেলপথের উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে

জাপানের কোবে বন্দর থেকে ৩১শে মার্চ ২০২১ বাংলাদেশের মোংলা বন্দরে পৌঁছেছে ঢাকার মেট্রোরেলের ট্রেন সেট বহনকারী জাহাজ

রেলপথ মন্ত্রী মো. নুরুল ইসলাম সুজন বলেন, একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সকল যোগাযাগ ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা দরকার। সুষম যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই রেলকে এখন ঢেলে সাজানো হচ্ছে। ২০শে মার্চ ঢাকার একটি হোটেলে চ্যানেল আই আয়োজিত দিনব্যাপী কর্মশালায় বিষয়ভিত্তিক আলোচনার অংশ হিসেবে 'বাংলাদেশ রেলওয়ের লক্ষ্য ২০৪১' বিষয়ের ওপর আলোচনায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, একটি যাত্রীবান্ধব ও আন্তর্জাতিক মানের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরির লক্ষ্যে রেলওয়েতে বেশ কিছু প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী উল্লেখ করেন সকল জেলার সাথে রেল সংযোগ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মিটার গেজ লাইনকে ব্রডগেজ লাইনে রূপান্তরিত করা হচ্ছে, সিঙ্গেল লাইনকে পর্যায়ক্রমে ডাবল লাইনে রূপান্তর করা হবে। প্রতিবেশী

দেশগুলোর সাথে রেলপথ সংযোগ স্থাপনের জন্য অভ্যন্তরীণ সক্ষমতার বিকাশ ঘটানো হচ্ছে। পদ্মা রেল লিংক প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা এবং যশোরের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু রেল সেতু নির্মিত হচ্ছে। আখাউড়া-লাকসাম ডাবল লাইন তৈরি হচ্ছে। ভারত ছাড়াও নেপাল, ভুটান, চীনের সাথে রেলপথের মাধ্যমে বাংলাদেশ যুক্ত হচ্ছে।

প্রতিবেদন : জাহিদ হোসেন নিপু

ইতিহাস ও ঐতিহ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

তাজহাট জমিদারবাড়ি

বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে তাজহাট জমিদারবাড়িটি একটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে আসছে। রংপুর নগরীর অনন্য সৌন্দর্যবর্ধন করে চলছে তাজহাট জমিদারবাড়ি ও জাদুঘর। ভবনটির সৌন্দর্য এবং নৌকা প্রতীকে আঁকা বাগানটি দর্শনার্থীদের কাছে টানে। শত বছরের বেশি সময় ধরে এই বাড়িটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

১৯৯৫ সালে এ ভবনটিকে প্রত্নতত্ত্ব সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়। ২০০২ সালে এটিকে জাদুঘরে রূপান্তর করা হয়। জাদুঘরটির নাম রাখা হয় 'রংপুর জাদুঘর'। বর্তমানে এটি ১৬ দশমিক ৬ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই জাদুঘরে তিনশর বেশি মূল্যবান নিদর্শন রয়েছে। প্রতিদিন দেশি-বিদেশি পর্যটক এই বাড়ির সৌন্দর্য দর্শনে আসেন। এই বাড়ির প্রাঙ্গণের বাগান মানুষের নজর কাড়ে। বিশেষ করে ছোটো ছোটো গাছ দিয়ে বানানো নৌকা প্রতীকটি।

তাজহাট জমিদারবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন মান্নালাল রায়। তিনি ভারতের পাঞ্জাব থেকে এসেছিলেন। পেশায় ছিলেন একজন স্বর্ণকার। স্বর্ণখচিত টুপি বা তাজ নির্মাণ করায় এই অঞ্চলের নাম তাজহাট হয়েছে। জাতিতে ক্ষত্রিয় হলেও তার শিখ ধর্মের প্রতি দুর্বলতা ছিল। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সঙ্গে শিখদের সংঘাতের সময় স্বর্ণ ব্যবসায়ী মান্নালাল পাঞ্জাব থেকে পালিয়ে রংপুরের মাহিগঞ্জে বসতি স্থাপন করেন। মাহিগঞ্জে তিনি হীরা মণি মুক্তা খচিত টুপি (তাজ) বিক্রি করতেন। আর এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় তার জমিদারি। রংপুর শহর থেকে পুব দিকে ৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থান এই জমিদারবাড়ির।

১৮৯৭ সালে ভূমিকম্পে ভবনটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে বাড়িটি নতুন করে তৈরি করা হয়। ৫৬ একর এলাকাজুড়ে এই কমপ্লেক্সটির পুবমুখী দোতলা এই জমিদারবাড়িটির সামনের দিকে প্রায় ৭৭ মিটার দৈর্ঘ্য। বাড়ির সামনের দিকে রয়েছে বড়ো একটি দালান। এই দালানে ওঠার জন্য শ্বেতপাথরে আবৃত রয়েছে দৃষ্টিনন্দন সিঁড়ি। বাড়ির ছাদের মূল অংশে আট কোনা পিলারের ওপর অবস্থিত রেনেসাঁ গম্বুজ। এই গম্বুজের বৈশিষ্ট্য হলো এটি আংশিকভাবে সরু পিলারের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রাসাদের গৃহমুখের দুই প্রান্তে অষ্টাভুজাকৃতির বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার অংশ রয়েছে। প্রাসাদের ভূমি নকশা অনেকটা ইংরেজি টি-এর মতো। প্রাসাদে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়ে ১৪/১৯ মিটার বিশাল হলঘর। হলঘরের দুই দিকে একটি করে ঘর রয়েছে। প্রাসাদটির ভিতর ৩ মিটার প্রশস্ত একটি টানা বারান্দা ও পুরো

তাজহাট জমিদারবাড়ি

ভবনে ২২টি ঘর রয়েছে। এই জমিদার বংশের মধ্যে জনপ্রিয় জমিদার ছিলেন গিরিধারি লাল রায়। ১৮৭৯ সালে তার মৃত্যু হলে তার ছেলে গোবিন্দলাল রায় জমিদারি লাভ করেন। গোবিন্দলাল রায় প্রজাহিতৈষী ও দানশীলতার জন্য ১৮৮৮ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক রাজা, ১৮৯২ সালে রাজা বাহাদুর ও ১৮৯৬ সালে মহারাজা উপাধিতে ভূষিত হন। এই সময়টিই ছিল তাজহাট জমিদারদের সোনালি অধ্যায়। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পর বাড়িটি চলে যায় কৃষি বিভাগের অধীনে। এখানে গড়ে উঠে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। ১৯৮৪ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত তাজহাট রাজবাড়িটি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাই কোর্ট বেঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রতিবেদন : ফারিহা রেজা

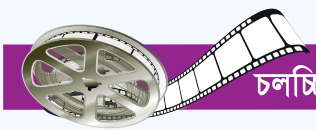

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

সরকারি অনুদানে নির্মিত *যৈবতী কন্যার মন*

সরকারি অনুদানে নির্মিত পরিচালক নার্গিস আক্তারের চলচ্চিত্র *যৈবতী কন্যার মন* মুক্তি পেয়েছে। ১৯শে মার্চ নাট্যাচার্য সেলিম আলদীনের মঞ্চনাটক *যৈবতী কন্যার মন* অবলম্বনে ছবিটি নির্মাণের জন্য ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে অনুদান পান নার্গিস আক্তার।

পরিচালনার পাশাপাশি মূল গল্প ঠিক রেখে ছবির চিত্রনাট্যও করেছেন তিনি। ছবিতে কালিন্দী চরিত্রে কলকাতার সায়ন্তনী দত্ত ও আলাল চরিত্রে অভিনয় করেছেন বাংলাদেশের আবদুন নূর।

বঙ্গবন্ধুর ওপর নির্মিত *বাবা* পুরস্কার পেল ভারতে

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৫ই আগস্টে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পটভূমিতে নির্মিত মিউজিক্যাল ফিল্ম *বাবা* পুরস্কার পেয়েছে। ভারত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০২০-এ এটি সেরা মিউজিক্যাল ফিল্ম নির্বাচিত হয়েছে। ছবির গানে কণ্ঠ দিয়েছেন নাফিসা শামা।

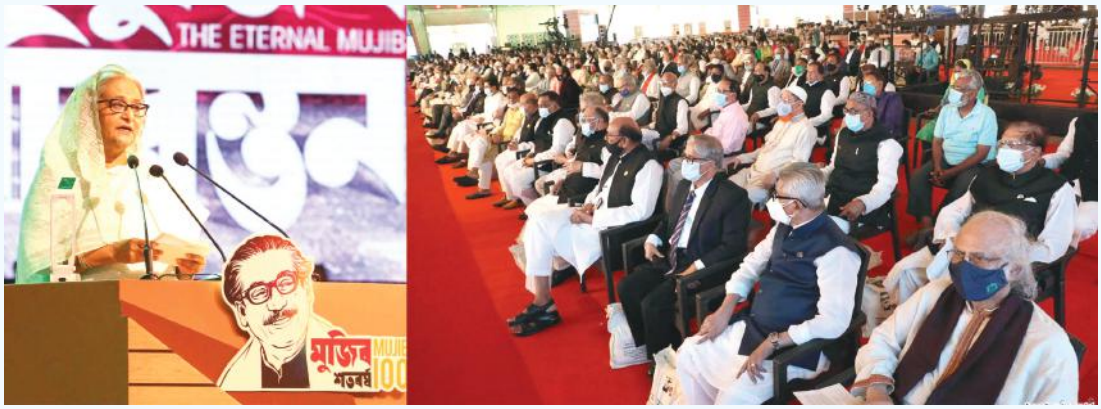

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই মার্চ ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন– পিআইডি

গত বছরের আগস্টে ৬ মিনিট ২ সেকেন্ড দৈর্ঘ্যের মিউজিক্যাল ফিল্ম *বাবা* ইউটিউবে মুক্তি দেওয়া হয়। পরিচালক রেমন্ড সলোমন জানান, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ৬০টির বেশি চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে গীতিচিত্র বাবা জমা দেওয়া হয়। মিউজিক্যাল ফিল্ম *বাবা* তৈরিতে সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন আবুল হাসনাত মিল্টন।

সরকারি অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র *ফিরে দেখা*

প্রথমবারের মতো সিনেমা পরিচালনা করেছেন চলচ্চিত্র অভিনেত্রী রোজিনা। সরকারি অনুদানে তিনি নির্মাণ করছেন *ফিরে দেখা* নামের চলচ্চিত্রটি। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নির্মিতব্য এ সিনেমায় তিনি অভিনয়ও করবেন। তাঁর বিপরীতে দেখা যাবে ইলিয়াস কাঞ্চনকে। আরো একটি জুটি হিসেবে থাকবেন নিরব ও স্পর্শিয়া।

প্রতিবেদন : মিতা খান

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে ১০ দিনের এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি। ১৭ই মার্চ থেকে ২৬শে মার্চ পর্যন্ত ১০ দিনের অনুষ্ঠানে বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে দেশি-বিদেশি অতিথিরা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানমালায় প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন থিমভিত্তিক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অডিও ভিজ্যুয়াল এবং অন্যান্য বিশেষ পরিবেশনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় ১৭ই মার্চ, ২২শে মার্চ ও ২৬শে মার্চ রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এবং ১৭, ১৯, ২২, ২৪ এবং ২৬শে মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সম্মানিত অতিথি হিসেবে ১৭ই মার্চ অনুষ্ঠানে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ, ১৯শে মার্চ শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষ, ২২শে মার্চ নেপালের প্রেসিডেন্ট বিদ্যা দেবী ভাণ্ডারি, ২৪শে মার্চ ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং এবং ২৬শে মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উপস্থিত হন। অনুষ্ঠানমালায় বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ধারণকৃত বক্তব্য প্রদর্শন করা হয়। প্রতিদিনের অনুষ্ঠান টেলিভিশন চ্যানেল, অনলাইন মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

অমর একুশে বইমেলা-২০২১

প্রতিবছর ফেব্রুয়ারির প্রথম দিনেই অমর একুশে গ্রন্থমেলা বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এবারে বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে বইমেলা ১৮ই মার্চ শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি এ মেলা উদ্‌বোধন করেন। এ সময় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, সচিব বদরুল ইসলাম, বাংলা একাডেমির সভাপতি শামসুজ্জামান খান ও বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী প্রমুখ।

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

চট্টগ্রামের ডবলমুরিং এলাকাকে মাদকমুক্ত ঘোষণা

চট্টগ্রাম নগরের ডবলমুরিং থানা এলাকাকে দেশের প্রথম মাদকমুক্ত থানা হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ। এজন্য থানা, ওয়ার্ড এবং পাড়াভিত্তিক ১০০ সদস্য বিশিষ্ট ১০০টি মাদক নির্মূল কমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১২ই মার্চ আগ্রাবাদ গাউছিয়া ইসলামি পাঠাগার আয়োজিত এক সমাবেশে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা দেন ডবলমুরিং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মহসীন।

'মাদকমুক্ত ডবলমুরিং থানা' গড়ার প্রথম ধাপে মুহুরিপাড়াকে প্রথম এলাকা হিসেবে মাদকমুক্ত ঘোষণা করা হয়। ডবলমুরিং থানার ওসি মোহাম্মদ মহসীন বলেন, আমরা দেশের প্রথম থানা হিসেবে মাদকমুক্ত থানা হওয়ার জন্য কাজ করছি। তারই প্রথম সাফল্য এটি। প্রথম এলাকা হিসেবে আমরা মুহুরিপাড়াকে মাদকমুক্ত ঘোষণা করেছি। ধাপে ধাপে আমরা থানা সংশ্লিষ্ট সব এলাকাকেই মাদকমুক্ত ঘোষণা করব।

অস্ত্র পাচ্ছে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার বলেন, সাধারণত যারা মাদক ব্যবসায়ী থাকে তারা অনেক ভয়ংকর হয়। অনেক সময় আমাদের ওপর অস্ত্র প্রয়োগ করেছে তারা। এই ধারাবাহিকতায় এখন অনুধাবন করছি, আমাদের অস্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে। ৪ঠা মার্চ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

আহসানুল জব্বার বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সচিবের তত্ত্বাবধানে একটি কমিটি রয়েছে। এই কমিটি এখন বিচার-বিশ্লেষণ করছে কীভাবে কী উপায়ে আমাদেরকে অস্ত্র দেওয়া হবে। এ সময় দেশের চলমান মাদক নিরাময় কেন্দ্রে কোনো ধরনের অন্যায়-অনিয়ম পাওয়া গেলে সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। মন্ত্রিসভা থেকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরকে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন : জান্নাত হোসেন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উপলক্ষে র‍্যালি ও মেলার উদ্‌বোধন

'বাংলাদেশের এক অনন্য অর্জন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ'– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উপলক্ষে রাঙামাটিতে বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আলোচনাসভা ও দুই দিনব্যাপী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ২৭শে মার্চ সকালে রাঙামাটি জেলা প্রশাসনের কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জিমনেসিয়াম মাঠে এসে শেষ হয়। সেখানে দুই দিনব্যাপী মেলার উদ্‌বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মো. নুরুল আলম নিজামী।

রাঙামাটিতে উপকারভোগী মহিলাদের মাঝে হেলথ ক্যাম্প ও উপকরণ বিতরণ

রাঙামাটিতে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নির্বাচিত উপকারভোগীদের হেলথ ক্যাম্প ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩১শে মার্চ সকালে রাঙামাটি শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে রাঙামাটি জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ও রাঙামাটি জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে এই হেলথ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাঘাইহাট জোনের চিকিৎসা সেবা

জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাঘাইহাট জোনের উদ্যোগে চিকিৎসা সেবা পেল দুর্গম সাজেক এলাকার দুই শতাধিক দুস্থ পরিবার। জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ৫ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স, খাগড়াছড়ি এবং বাঘাইহাট জোট (১২ বীর)-এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সাজেক এলাকায় ১৮৮ জন রোগীর মধ্যে ১০০ জন পাহাড়ি ও ৮৮ জন বাঙালির মাঝে দিনব্যাপী বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং ঔষধ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উক্ত মেডিকেল ক্যাম্পেইনে ৫ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স খাগড়াছড়ির মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এবং দন্ত রোগ চিকিৎসক কর্তৃক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

রাঙামাটিতে সমাজসেবা অধিদপ্তরের উদ্যোগে রোগীদের মাঝে আর্থিক অনুদান প্রদান

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদপ্তরের উদ্যোগে ক্যানসার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোক, প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় রোগীদের মাঝে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ২৬শে মার্চ সকালে রাঙামাটি

পার্বত্য জেলা পরিষদের সভাকক্ষে জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের আয়োজনে চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে রোগীদের মাঝে চেক বিতরণ করেন রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অংসুইপ্র চৌধুরী এবং রাঙামাটি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান।

প্রতিবেদন : আসাব আহমেদ

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

শিশুদের আলোকিত জীবন গড়ার আহ্বান

ভবিষ্যতে উন্নত জীবন গড়ে তোলার জন্য শিশুদের জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও মাদক থেকে দূরে রাখার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা ১৭ই মার্চ ২০২১ টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন– পিআইডি

আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এ আহ্বান জানান। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি অংশ নেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী স্বপ্নীল বিশ্বাস অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ পরিবেশন করেন। ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী আনুসুয়া অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বলেন, অভিভাবক, শিক্ষক এবং সমাজের যারা বিশিষ্ট জন সকলের প্রতি আমি অনুরোধ করব। শিশুদের প্রতি কোনো ধরনের অত্যাচার বা প্রতিহিংসামূলক কাজ যাতে না হয় সে ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে এবং জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস এবং মাদকের হাত থেকে শিশুদের মুক্ত রাখতে হবে। যারা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে আছেন এবং জনগণের প্রতিনিধি, তাঁদের সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

শিশুদের বিশেষ ধরনের ক্যান্সারও নিরাময় হবে

শিশুদের হয় এমন এক ধরনের ভয়ংকর ক্যান্সার সারানোর নতুন উপায় উদ্ভাবন করলেন বিজ্ঞানীরা। এটি বিশ্বে প্রথম। ওই বিশেষ ধরনের ক্যান্সারের নাম নিউরোব্লাস্টোমা। ভয়ংকর এই ক্যান্সারে প্রতিবছরই বহু শিশু আক্রান্ত হয়। গবেষকরা মনে করছেন, এই উদ্ভাবন আগামী দিনে ব্রেন টিউমারসহ শিশুদের আরো কয়েক ধরনের ক্যান্সার এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জরায়ু ও প্রস্টেট ক্যান্সার চিকিৎসারও নতুন পথ খুলে দেবে।

অস্ট্রেলিয়ার চিলড্রেনস ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের গবেষকদলের এই গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে নেচার কমিউনিকেশনস সাময়িকীতে। গবেষকরা মানবকোষে একটি বিশেষ ধরনের প্রোটিনের হদিস পেয়েছেন। প্রোটিনটির নাম অ্যালিরেফ। তাঁরা দেখেছেন, শিশুদের নিউরোব্লাস্টোমা ক্যান্সার হওয়ার জন্য মূলত যে জিনটি দায়ী, সেই এমওয়াইসিএন জিনের সক্রিয়তা দ্রুত বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এই প্রোটিনটির। গবেষণায় দেখা গেছে, ক্যান্সার কোষগুলোতে এমওয়াইসিএন জিনের মাত্রা ও সক্রিয়তা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় বলে এক-তৃতীয়াংশ শিশুর ক্ষেত্রে নিউরোব্লাস্টোমা দুরারোগ্য হয়ে ওঠে। যদিও ওই জিনকে লক্ষ্য করে কোনো ওষুধ তৈরি করা খুবই মুশকিল। তাই বিজ্ঞানীরা এত দিন শিশুদের ক্যান্সারে আক্রান্ত কোষে এমওয়াইসিএন জিনের কারা সহযোগী তাদের খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন, যাতে সেই সহযোগীদের অন্তত ওষুধ দিয়ে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া সম্ভব হয়।

প্রতিবেদন : নাসিমা খাতুন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

অটিজম নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে

বাংলাদেশের অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন এবং বিশ্বস্বাস্থ্য

সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের শুভেচ্ছা দূত সায়মা ওয়াজেদ পুতুল বলেন, করোনা মহামারিকালে শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবা বিঘ্নিত হওয়ার ফলে সারা বিশ্বে অটিজমের শিকার শিশুরা সামঞ্জস্যহীনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তবে বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা, শক্তিশালী তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো এবং বিস্তৃত কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা অনেক পরিবারকে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সাহায্য করেছে। ৬ই এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ আয়োজিত 'কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে অটিজম; বৈশ্বিক সাড়াদান ও পুনরুদ্ধারে কীভাবে প্রযুক্তি সহায়তা করতে পারে' শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সাইড ইভেন্টে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে জাতিসংঘস্থ বাংলাদেশ, ব্রাজিল, কুয়েত, পোল্যান্ড, কাতার ও কোরিয়া স্থায়ী মিশন এবং জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াবলি বিভাগ ও অটিজম স্পিকস।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন সমাজে অটিজমের শিকার পরিবারবর্গ যেসব সামাজিক চ্যালেঞ্জ ও নিগ্রহের মুখোমুখি হয় তার উদাহরণ টেনে সায়মা ওয়াজেদ বলেন, এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সচেতনতা বৃদ্ধি ও তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে টেকসই ও ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন আনতে পেরেছে। এছাড়া ভার্চুয়ালভাবে আয়োজিত এই সভায় বক্তব্য প্রদানকালে কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে অটিজম আক্রান্ত শিশু ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য বিশেষ সহায়তা পদক্ষেপ গ্রহণ ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারসহ বাংলাদেশের উত্তম অনুশীলনগুলো তুলে ধরেন সায়মা।

প্রতিবন্ধীদের হুইল চেয়ার ও সেলাই মেশিন দিলেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী

জামালপুরের সরিষাবাড়ি উপজেলায় মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধী ও দুস্থদের মাঝে হুইল চেয়ার ও সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। ১৩ই মার্চ উপজেলার আওনা ইউনিয়নের দৌলতপুর গ্রামে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসানের নিজ বাড়িতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব বিতরণ করা হয়। এ সময় প্রতিমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিবন্ধী ও দুস্থদের মাঝে হুইল চেয়ার ও সেলাই মেশিন বিতরণ করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শিহাব উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্ব করেন।

প্রতিবেদন : অমিত কুমার

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু কাপ কাবাডি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ট্রফি হাতে উঠল বাংলাদেশের। ২রা এপ্রিল পল্টন সংলগ্ন ভলিবল স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের ফাইনালে পিছিয়ে থেকেও কেনিয়াকে ৩৪-২৮ পয়েন্টে হারিয়ে স্মরণকালে প্রথমবারের মতো কোনো ট্রফি জিতল বাংলাদেশ কাবাডি দল। এদিন টুর্নামেন্টে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত কেনিয়াকে হারিয়ে বাংলাদেশের কাবাডি খেলোয়াড়রা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে দেশকে উপহার দিয়েছে আন্তর্জাতিক ট্রফি।

টেস্ট স্ট্যাটাস পেল বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল

টেস্ট স্ট্যাটাস পেল বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। বোর্ড এবং কমিটি মিটিংয়ে বাংলাদেশ নারী দল, আফগানিস্তান নারী দল এবং জিম্বাবুয়ে নারী দলকে টেস্ট স্ট্যাটাস দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি। ২রা এপ্রিল এক বিজ্ঞপ্তিতে আইসিসি জানায়– বোর্ড সভায় আইসিসির পূর্ণাঙ্গ নারী দল সদস্যদের ওয়ানডে এবং টেস্ট স্ট্যাটাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও জিম্বাবুয়ে নারী ক্রিকেট দল এখন থেকে টেস্টও খেলতে পারবে।

সব ম্যাচেই জিতল বাংলাদেশ

মিরপুরে টি-টোয়েন্টিতে ১৬ই মার্চ আয়ারল্যান্ড উলভসকে ৩০ রানে হারিয়ে সাফল্যের ষোলোকলা পূর্ণ করেছে বাংলাদেশ। এর আগে আন-অফিসিয়াল একমাত্র টেস্ট ও ওয়ানডে সিরিজের

ক্রীড়া ইমার্জিং দলের ইনিংসে ফিফটি তুলে নেন তৌহিদ হৃদয়

চারটি ম্যাচ হারে আইরিশরা। 'হোম অব ক্রিকেট' খ্যাত মিরপুরের শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নামে সাইফ হাসানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ইমার্জিং দল। ২০ ওভার খেলে ৭ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ সংগ্রহ করে ১৮৪ রান। জবাবে আয়ারল্যান্ড উলভস ব্যাট করতে নেমে ১৮.১ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ১৫৪ রান করতে সক্ষম হয়। ফলে ৩০ রানের সহজ জয় পায় বাংলাদেশ।

মুজিববর্ষ দাবা লিগে পুলিশ চ্যাম্পিয়ন

মুজিববর্ষ প্রিমিয়ার দাবা লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ। নয় খেলায় পুরো আট পয়েন্ট পেয়েছে তারা। পয়েন্ট টেবিলে এককভাবে শীর্ষে থেকে এক রাউন্ড বাকি থাকতে শিরোপা জয় করে পুলিশ। ২৯শে মার্চ দশম রাউন্ডের খেলায় বাংলাদেশ পুলিশ ৩.৫-০.৫ গেম পয়েন্টে জনতা ব্যাংক অফিসার ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে হারিয়ে শিরোপা জয় করে। বাংলাদেশ পুলিশ দলের পক্ষে এবারের আসরে অংশ নেন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান, দুই ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার সূর্যশেখর গাঙ্গুলী ও রনৌক সাদভানি এবং বাংলাদেশের দুই গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমান ও মোল্লা আবদুল্লাহ আল রাকিব।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

ভাষাসৈনিক ইউসুফ কালু চলে গেলেন না ফেরার দেশে

আফরোজা রুমা

ভাষাসৈনিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক মোহাম্মদ ইউসুফ কালু চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ২৯শে মার্চ বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এই বীর মুক্তিযোদ্ধা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

ইউসুফ কালু ১৯৩১ সালের ১৭ই জানুয়ারি ঝালকাঠি রাজাপুরের কানুদাসকাঠি মিয়াবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ওবায়দুল করিম রাজামিয়া ও মা ফাতেমা খাতুন। তিন ভাই ও দুই বোনের মধ্যে সবার ছোটো ছিলেন তিনি। ইউসুফ কালুর হাতেখড়ি পাঠশালায়। সংগঠন শুরু শিশু-কিশোরদের মুকুল ফৌজ দিয়ে। ১৯৪৮ সালে বরিশাল বিএম স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন ইউসুফ কালু। প্রগ্রেসিভ ছাত্রফ্রন্টের নেতা এমায়দুলের নেতৃত্বে মিছিলে যোগ দিয়ে প্রথমদিনই পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হন। এরপর মেট্রিকুলেশন পাস করে ১৯৫১ সালে বিএম কলেজে এইচএসসিতে (কমার্স) ভর্তি হন। তখন থেকে ভাষা সংগ্রামে তাঁর সম্পৃক্ততা আরো বেড়ে যায়।

তৎকালীন ছাত্রলীগের সভাপতি ও বিএম কলেজ ছাত্র সংসদের ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) সৈয়দ গোলাম কিবরিয়াকে আহ্বায়ক করে বিএম কলেজে গঠন হয় ২৫ সদস্যের ভাষা সংগ্রাম পরিষদ। সেই কমিটির সদস্য হন ইউসুফ কালু। আন্দোলনের গতি বাড়লে সেই কমিটির কলেবর বৃদ্ধি করে ৮১ সদস্য বিশিষ্ট বৃহত্তর বরিশাল ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।

শিক্ষা জীবনের প্রথমে ছাত্র ইউনিয়ন করেছেন কালু। ১৯৫২ সালে যোগ দেন ছাত্রলীগে। পরে জড়িয়ে পড়েন আওয়ামী রাজনীতির সঙ্গে। তিনি স্বৈরাচার বিরোধী ও প্রতিটি প্রগতিশীল আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

১৯৫৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে বরিশালে প্রচারণায় আসেন তৎকালীন পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খান আব্দুল কাইউম। কাইউমকে ঠেকাতে কালো পতাকা মিছিলসহ আন্দোলন সংগ্রামে অংশ নেন ইউসুফ কালু। ওই মিছিলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে কাউনিয়ার বাসিন্দা মালেক নামে একজন নিহত হন। ইউসুফ কালুসহ ৩৫ জন গ্রেফতার হন। ২২ দিন পর জামিন পেয়ে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের হয়ে কাজ শুরু করেন তিনি।

১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানসহ প্রতিটি আন্দোলনেই দেশ ও মানুষের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধও করেন তিনি। ১৯৭১ সালের ১৪ই মে কলকাতা লালবাজারে বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির সহযোগিতায় হাসনাবাদ হিংগলগড়, টাকি হেডকোয়ার্টার্সে প্রশিক্ষণ নেন। দেশে ফিরে ৯ নম্বর সেক্টরের অধীনে কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরার সীমান্ত এলাকায় পাকবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ করেন।

মুক্তিযোদ্ধা ইউসুফ কালু মুক্তিযুদ্ধকালীন নুরুল আলম ফরিদ সম্পাদিত রণাঙ্গনের মুখপত্র 'বিপ্লবী বাংলাদেশ' পত্রিকার পরিচালকদের একজন ছিলেন। ১৯৭১ সালে তার বাড়ি লুট হয়। তখন দলিলপত্র, ব্যক্তিগত কাগজপত্র সবকিছু খোয়া যায়। ১৯৬২ সালে সাংবাদিকতা শুরু করেন। প্রথমে *আজাদ* ও পরে *দৈনিক পয়গাম*-এর বরিশাল সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেন। বরিশাল প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত। ওই একই সময়ে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল খেলায় পারদর্শী ইউসুফ কালু বরিশাল ক্রীড়া সংস্থারও সদস্য ছিলেন।

৩০শে মার্চ নগরীর বগুড়া রোডের শ্রী চৈতন্য মোহন বিদ্যালয় মাঠে তাঁর প্রথম নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে চৈতন্য স্কুল মাঠে বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম ইউসুফ হোসেন কালুকে পুলিশের একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার এবং রাষ্ট্রীয় সালাম দেওয়া হয়।

জানাজা শেষে ইউসুফ কালুর মরদেহ বিশেষ ব্যবস্থায় ঝালকাঠির রাজাপুরের গালুয়া ইউনিয়নের কানুদাসকাঠি গ্রামের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বাদ জোহর দ্বিতীয় নামাজে জানাজা শেষে তাঁর মরদেহ পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 41, No. 10, April 2021, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd